মনের
মানুষ
www.allbdbooks.com

মনের মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন চোর ধরা পড়েছে মাঝ রাত্তিরে। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে উঠোনে একটা খুঁটিতে। সকালবেলা তার বিচার হবে।

গড়াই নদীর ধারে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বাসগৃহে মানুষজনের সংখ্যা অনেক। তাঁর দুই স্ত্রী ও সাতটি পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজন ও আশ্রিত, সব মিলিয়ে উনিশজন। পাশের ঘরে উনুনের আগুন নেভে না, উদয়-অস্ত চলে অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন। একটি বেশ বড় বৃত্তাকার উঠোন ঘিরে মোট সাতটি টিনের চালার ঘর, একদিকে একটি কোঠা বাড়ি। গাছপালা প্রচুর।

এই গৃহ চত্বরের দু'দিকে দু'টি পুষ্করিণী। তার একটির ধারে ধারে কয়েক ঘর ধোপা, নাপিত ও জেলের বাস। কবিরাজ মশাই-ই তাদের জমি দিয়েছেন, তাই সম্বৎসর সেবা পান। গোয়ালঘরে আছে পাঁচটি গরু এবং পাশের আস্তাবলে একটি ঘোড়া।

কবিরাজ মশাই প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করেন। তার পর এ বাড়ির আর কারওর ঘুমিয়ে থাকার উপায় নেই। ভোর হতে না হতেই শুরু হয় কর্মযজ্ঞ। রাত্তিরেও সব কিছু মিটিয়ে বাতি নিভিয়ে দিতে অনেক দেরি হয়। তার পরেও দু'জন ব্যক্তি বল্লম হাতে পাহারায় থাকে। সুতরাং এ বাড়িতে চোর আসা অতি দুর্লভ ঘটনা।

গাত্রোত্থানের পরই কবিরাজমশাইকে চোর ধরা পড়ার খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের পর পুজোয় বসেন এবং পুজো শেষ করার আগে তিনি বিশেষ কথা বলেন না। কোনওদিন তাঁর এই

নিয়মের ব্যত্যয় হয় না।

খুঁটির সঙ্গে বাঁধা চোরটির বয়স হবে চব্বিশ-পঁচিশ। ডাকাত বললেই যেমন গুম্ফধারী ষণ্ডামার্কা চেহারার পুরুষের কথা মনে হয়, তেমন চোর শুনলেই মনে হয় যেন রোগা, ক্যাংলা, কালো কালো চেহারার মানুষ। এ চোর কিন্তু তেমন নয়, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, মাথা ভর্তি চুল। একটা ছেঁড়া ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, খালি গা। যথেষ্ট মার খেয়েছে, পিঠে সেই দাগ।

বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চারা সার বেঁধে বসে আছে একটু দূরে। তাদের সবার চোখে বিস্ময়। আরও কিছু মানুষ ভিড় জমিয়েছে, কবিরাজমশাই কী বিচার করেন, তা জানার জন্যই সকলের কৌতূহল। কিছুদিন আগে কুমারখালিতে এক চোরকে হাত বেঁধে একটা অশত্থগাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, দু'দিন পরে সেখানেই সে অক্কা পায়। একটা তক্ষক সাপ নাকি তাকে দংশেছিল।

রোদ ওঠার পর খড়ম খটখটিয়ে কবিরাজমশাই এসে দাঁড়ালেন উঠোনে। তাঁর পরনে পট্টবস্ত্র ও একটি উড়নি। শীত-গ্রীষ্ম কোনও সময়েই তিনি সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করেন না। বয়স হয়েছে ঢের, কিন্তু এখনও বার্ধক্য তাঁকে কাবু করতে পারেনি। মাথার চুল সব সাদা।

একটুক্ষণ চোরের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জিনিসপত্র কিছু সরিয়েছে?

যদু ও জগাই নামে দুই পাহারাদার এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। চোর ধরার

কৃতিত্ব এদেরই।

জগাই বলল, না হুজুর, কিছু সরাতে পারেনি। তার আগেই হাতে-নাতে ধরেছি।

কোথায় ধরলি?

রাত্তির তখন দুই প্রহর হবে, হুজুর। হঠাৎ শুনি ঘোড়াটা চিঁহি করে উঠল। তারপর লাফালাফি করতে লাগল। সন্দেহ হতেই আমরা দুইজন দৌড়ায়ে গেলাম। তখন দেখি এ সম্বুন্ধির পো ঘোড়ার বাঁধন খুলতেছে—

চোরটির থুতনি বুকে ঠেকে গিয়েছিল, এবার সে মুখ তুলে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, না কর্তা, আমি বাঁধন দিতেছিলাম।

জগাই চেঁচিয়ে বলল, চোপ! কথা কবি না!

কবিরাজমশাই বললেন, ওরে, আমার জলচৌকিটা নিয়ে আয়।

একজন কেউ দৌড়ে ভেতর বাড়ি থেকে একটা জলচৌকি নিয়ে এল। কবিরাজমশাই তার ওপর বসে বললেন, তামাক দে।

তারপর চোরের দিকে চেয়ে বললেন, আমার ঘোড়া চুরি করতে এসেছিলি। তুই তো মহা বলদ! এই ঘোড়া সবাই চেনে। তোর কাছ থেকে কে খরিদ করত? কেউ না!

ঘোর বর্ষার সময় সব দিক জলমগ্ন হয়ে যায়। তখন নৌকো ছাড়া যাতায়াতের কোনও অন্য উপায় থাকে না। শীত-গ্রীষ্মে হাঁটা পথ। একটু দূরে রুগি দেখতে যেতে হলে কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোড়াতেই যান। অনেকদিনের অভ্যাস। এই টাট্টু ঘোড়াটির নাম মানিকচাঁদ।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সম্পন্ন গৃহস্থ। জমি জমা ও ফলের বাগান আছে। বাড়িতে দুধ-ঘি ও মাছ-ভাতের অভাব নেই। এই বয়সে অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁর আর রুগি দেখার জন্য দূর-দূরান্তে যাবার প্রয়োজন হয় না, তবু কোনও সঙ্কটাপন্ন রুগির বাড়ি থেকে ডাকতে এলে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

চোর আবার বলল, কর্তা, আমি ঘোড়া চুরি করি নাই। ফিরত দিতে এসেছিলাম।

এ কথায় অন্যদের মধ্যে একটা হাসির তরঙ্গ খেলে গেল।

কবিরাজমশাইও হেসে বললেন, সে কী রে, ঘোড়া আমার। তোরে কি কখনও দিছি যে, তুই ফিরত দিবি? চোরে কোনওদিন কি কিছু ফিরত দেয়?

যদু ধমক দিয়ে বলল, চোপ! তোরে আমরা বাঁধন খোলতে দেখছি।

চোর আবার শান্তভাবে বলল, না, খোলতে দেখো নাই। যখন আমি নিছিলাম, তখন বাঁধন ছিল না, ছাড়াই ছিল।

কবিরাজ বিস্মিতভাবে বললেন, এই হারামজাদাটা কয় কী! আমার মানিকচাঁদরে আগেই নিছিল! কই রে, তামাক দিলি না? আর এই চোরটার হাতের দড়ি খুলে আমার সামনে নিয়ে আয়।

কবিরাজমশাই এ সব আদেশ কোনও ব্যক্তিবিশেষের দিকে তাকিয়ে করেন না। সবসময় তাঁর হুকুম পালনের জন্য কাছাকাছি একগন্ডা লোক থাকে।

একজন তাঁর হাতে হুঁকো এনে ধরিয়ে দিল। যদু ও জগাই খুঁটি থেকে চোরটিকে খুলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল মনিবের সামনে। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে, হাতজোড় করে বসল।

কবিরাজ হুঁকোয় দু'টান দেবার পর জিজ্ঞেস করলেন, কী কইলি, ঠিক করে ক' তো! হেঁয়ালি করবি তো এই খড়ম দেখছিস। তোর মাথায় ভাঙব। তুই আমার ঘোড়া চুরি করতে আসিস নাই?

না কর্তা।

মিথ্যা কথা বলে পার পাবি? আমারে চেনোস না। আরও কাছে আয়, মাথাটা ঝুঁকা।

কবিরাজ সেই চোরের কপালটা ভাল করে দেখলেন। একটা আঙুল রাখলেন দুই ভুরুর মাঝখানে।

বিড় বিড় করে আপনমনে বললেন, এটা যে চোর, তা তো ললাটে লেখা নাই, বরং দেখি বড় একটা ফাঁড়া আছে। দুই এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুযোগ। ঘাগু চোর না, আবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তো পিট্টি খেয়েই মরবি!

চোর এবার যা খুলে বলল, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়। ঘোড়া চুরি করা তার উদ্দেশ্য নয়। গতকাল রাতে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়েছিল অনেক আগে, তখন কেউ টের পায়নি। ফিরিয়ে দিতে আসার পর সে দু'বার কেশে ওঠে, তবেই ধরা পড়ে। এর আগেও কয়েকবার সে ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে চড়েছে। তাতে কোনও দোষ হয় বলে সে বোঝেনি, সে ক্ষমা চাইছে।

কবিরাজ প্রশ্ন করলেন, ঘোড়া নিয়ে তুই কোথায় যাস?

চোর বলল, কোথাও যাই না, কর্তা। মাঠের মধ্যে ঘুরি, বড় ভাল লাগে। এক এক সময় মনে হয়, কোন দূর দেশে চলে গেছি, কোথাও কেউ নাই, কুলকুল করে নদী বয়ে যাচ্ছে।

তাকে থামিয়ে দিয়ে কবিরাজ বললেন, তুই সত্য কথা বলছিস কি না এখনই বোঝা যাবে। ওরে, কেউ আমার মানিকচাঁদরে এখানে নিয়ে আয়।

কেউ একজন দৌড়ে গিয়ে টাট্টু ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে নিয়ে এল।

কবিরাজ চোরকে বললেন, তুই ওর পিঠে চাপ দেখি আমার সামনে। আমার মানিকচাঁদ কোনও অচেনা মানুষরে পিঠে রাখবেই না!

চোর উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে মানিকচাঁদের গলকম্বলে হাত দিয়ে একটু আদর করল। তারপর তড়াক করে চেপে বসল তার পিঠে।

মানিকচাঁদ স্থির রইল। অর্থাৎ এই সওয়ারকে সে চেনে।

চোর এবার ঘোড়াটাকে নিয়ে উঠোনে ঘুরপাক দিল দু'বার। এখন হঠাৎ যেন তার চেহারাটা বদলে গেছে। ছেঁড়া ধুতি পরা, নগ্ন পিঠে রক্তের দাগ, মাথার চুলে ধুলো, তবু সে যেন এক অজানা দেশের মানুষ।

কবিরাজ বললেন, ঠিক আছে, নাম। তোর যা হয়েছে, তারে বলে গরিবের ঘোড়া রোগ। এই রোগের নিদান নাই। দেখিস, তোর কপালে কিন্তু ফাঁড়া আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ফিরত দিস আর যাই-ই করিস, না বলে নিছিলি, তারে তো চুরিই বলে। সে জন্য তো শাস্তি পেতে হবে। তোর দুই হাতের দুইটা বুড়া আঙুল কেটে দিলে তুই জীবনে আর কিছু চুরি করতে পারবি না। কি? না, না, তোর ভয় নাই, তোরে আমি লঘু শাস্তি দেব।

এক পাশে ফিরে বললেন, ওরে, পরশু রাতের ঝড়ে যে-জারুলগাছটা উল্টে পড়েছিল, সেটা কাটা হয়েছে?

কেউ একজন বলল, না, হুজুর, এখনও কাটা শুরু হয় নাই।

কবিরাজ বললেন, হুঁ। এরে পুকুর ধারে নিয়ে যা, একটা কুড়াল দে। এই শোন, ওই বড় গাছটার সব ডালপালা কাট। পুকুরের ঘাটলার ডাইন দিকে সব কাঠ সাজিয়ে রাখবি, এই তোর সাজা।

তিনি চলে গেলেন কাছারি ঘরের দিকে।

এর মধ্যেই কিছু রুগি এসে অপেক্ষা করে আছে। কবিরাজমশাইকে রুগি দেখার আগে কিছুটা সময় বিষয়-কর্মে ব্যয় করতে হয়। বছরের এই সময়টায় স্বয়ং জমিদার আসেন কলকাতা থেকে। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গিয়ে তাঁকে নজরানা দিতে হয়। খাজনার হিসাব-পত্রও সব তৈরি রাখা দরকার।

আজ আবার পাশের দু'টি গ্রামে দু'জন রুগি দেখতে যেতে হবে, তাদের মধ্যে একজন প্রায় মরণাপন্ন। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে তিনি কোথাও যান না। দ্বিতীয় রুগিটির বাড়ির লোক এসে বসে আছে, তা থাকুক, তাঁকে তো নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের কথাও ভাবতে হবে। যার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তাকে তো তিনি ঔষধ দিয়েও বাঁচাতে পারবেন না।

বিকেলের রোদ একটু নরম হলে কবিরাজমশাই রওনা দিলেন।

তিনি যান ঘোড়ার পিঠে, ওষুধের বাক্স আর বল্লম হাতে নিয়ে যদু যায় এক পাশে, আর অন্য পাশে রুগির বাড়ির লোক। তিনি জোরে ঘোড়া ছোটান না, যান দুলকি চালে, পাশের লোকদেরও দৌড়তে হয় না।

কবিরাজের অর্থ লোভ নেই, কিন্তু তাঁর ভিজিট দু'টাকা ধার্য করা আছে। নইলে রুগির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না, অনেকেই তো তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়।

যাদের ভিজিট দেবার সামর্থ্য নেই, তারা গ্রামের রাস্তায় কবিরাজকে আসতে দেখলেই ছুটে আসে। কত মানুষের কতরকম রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসার সুযোগ নেই। কবিরাজ কিন্তু ঘোড়া থামান না, যদু সামনে

থেকে লোকজনদের সরিয়ে দেয়, তিনি লোকের অসুখের বিবরণ শুনতে শুনতেই দু'একটা আলগা উপদেশ দিয়ে চলে যান।

ফিরে আসতে আসতে তাঁর সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও অল্প অল্প জ্যোৎস্না আছে, তাই খুব অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া ফেরার সময় মানিকচাঁদ নিজেই পথ চিনে চলে আসে।

বাড়িতে ঢোকার আগে বামদিকের পুষ্করিণীর ঘাটে নেমে ভাল করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিতে হয়। ওষুধের পেটিকার মধ্যে একটা ছোট মাটির ঘটে গঙ্গাজল থাকে। সেই পবিত্রজলের একটুখানি মাথায় ছিটিয়ে নিলেই শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়।

এই গঙ্গা-বর্জিত দেশে গঙ্গার জল অনেক কাজে লাগে বটে, তবে দামও আছে। এক একটা ঘটের দাম দশ পয়সা। শেঠ কোম্পানির গঙ্গাজলই বিশ্বাসযোগ্য।

কবিরাজমশাই ঘাটে নেমে হাত পা ধুতে ধুতে কাছেই কোথাও খটাখট শব্দ শুনতে পেলেন।

কৌতূহলী হয়ে তিনি যদুকে বললেন, ও কিসের শব্দ, দ্যাখ তো?

যদু দৌড়ে গিয়ে দেখে এসে বলল, জারুলগাছটা কাটা চলতাছে।

কবিরাজ জিজ্ঞেস করলেন, এই রাত্তিরে কে গাছ কাটে?

যদু বলল, সেই চোরটা। আপনে আজ্ঞা দিছিলেন।

সারাদিনের ব্যস্ততায় কবিরাজ ভুলেই গিয়েছিলেন চোরের কথা। বিস্মিতভাবে বললেন, সে এখনও... ডাক তো তাকে!

যদু তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় তার ঘর্মাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে কবিরাজ বললেন, সেই সকাল থেকে তুই এখনও গাছ কেটে চলেছিস?

চোর বলল, বড় গাছ। জারুল কাঠ শক্ত হয়, শেষ হয় নাই। শেষ না করে যাব কী করে কর্তা!

সারাদিন ধরে তুই গাছ কেটেই চলেছিস?

আজ্ঞে না। অপরাধ মাপ করবেন। একসময় একটু ঘুমায়ে পড়েছিলাম। কাল রাইতে তো ঘুম হয় নাই, হঠাৎ ঘুম এসে গেছে, সেই সময়টায় কাজ করতে পারি নাই।

সারাদিন খেয়েছিস কিছু?

চোর এবার চুপ করে রইল। কবিরাজ সে নীরবতার অর্থ বুঝলেন। এ চোরটির সব কিছুই বড় বিচিত্র। ঘোড়া চুরি করে, আবার ফেরত দেয়। গাছ কাটতে বলা হয়েছে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটেই চলেছে। কেউ পাহারায় নেই, তবু পালায়নি। সারাদিন না খেয়ে আছে।

কবিরাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোর নাম কী? থাকিস কোথায়?

সে বললো, কর্তা, এই অধমের নাম লালমোহন কর। পিতার নাম ঈশ্বর রাধামাধব কর। তবে সবাই লালু বলেই ডাকে। থাকি দাসপাড়ায়।

কবিরাজ বললেন, বুঝলাম, তুই জাত-চোর না। তবে একটা কথা কই। শুনে রাখ। যখন নিজে উপার্জন করে ঘোড়া কিনতে পারবি, তখনই ঘোড়ায় চড়িস। অন্যের ঘোড়ায় চাপার শখ থাকলে, সারা জীবন কপালে দুঃখই থাকবে। এখন যা, তোর ছুটি।

কবিরাজের দুই পত্নী থাকে দু'টি মহলে। জ্যেষ্ঠাটিই সংসারের গৃহিণী। সকলের খাওয়া-পরা, দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর। তাঁর নাম গিরিবালা। ইদানীং কবিরাজমশাই রাত্রি কাটান ছোট বউ শোভাময়ীর কাছে, কিন্তু রাত্রির আহার করেন গিরিবালার পরিবেশনায়। তাতে কারুরই কোনও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থাকে না।

রাত্রিবেলা কবিরাজ রান্না করা আহার্য গ্রহণ করেন না। প্রতি রাতেই ফলাহার। চিঁড়ে, দই, কলা বা আম, গুড়, ক্ষীর ইত্যাদি।

পশমের আসনে বসে খাওয়া শুরু করার পর তিনি গিরিবালার কাছে সংসারের খবরাখবর নেন। ছেলে-মেয়েদের কথাও এই সময়েই শোনেন।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি বললেন, দিঘির ধারে একটা লোককে ঝড়ে-উল্টানো গাছটা কাটতে বলে গিয়েছিলাম, তাকে কিছু খাবার দাওনি?

গিরিবালা বললেন, আমাকে তো কিছু বলে যাননি। কেউ আমাকে কিছু খবরও দেয়নি। কে লোকটা?

ওই যে ঘোড়া চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল। তাকে ওই শাস্তি দিয়েছিলাম।

চোর? তাকে বাড়িতে ডেকে এনে জামাই-আদর করে খাবার দিতে হবে? কোন্ অজাত-কুজাত তা কে জানে!

চোরটা কিন্তু খুব বিশ্বাসী। সেই সকালে গাছ কাটতে বলে গেছি। একটা আস্ত জারুল গাছ। ও রাত পর্যন্ত কেটেই চলেছিল। ভেগে পড়েনি, এমন কখনও শুনেছ!

গিরিবালা গালে হাত দিয়ে বললেন, এদিকে বলছেন চোর, আবার বলছেন বিশ্বাসী। এমন কথাও তো কখনও শুনিনি। চোরের কথা শুনলেই আমার ডর লাগে।

গিরিবালার পেছনে একজন দাসী বসে আছে। সে ফিসফিস করে বলল, কত্তামা, ওই লোকটারে আমি আগে দেখেছি, ভাঁড়ারার হাটতলায় যে-যাত্রা হয়, গৌর-নিতাই পালা, তাতে ওই লোকটা গান গেয়েছে। ভাল গায়।

২

ভাঁড়ারায় নকুলেশ্বর দাসের যাত্রার দল অনেক পুরনো। নকুলেশ্বর পেশায় কুমোর, তার অভিনয়ের বেশ নাম-ডাক আছে। দলটি তার নিজের হাতে গড়া, প্রতি বছর অন্তত দু'টি পালা নামেই। সপ্তাহে দু'দিন ছাড়া অন্যদিন হাটখোলাটা ফাঁকাই থাকে, সেইখানে হয় মহড়া।

এ দলের নিয়মিত সদস্য দশ-বারোজন, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সকলেই নিরক্ষর। নকুলেশ্বরও সেই দলে। তবে, যশোরের বৃত্তি পাঠশালায় দু'বছর পাঠ নিয়ে এসেছে মতিলাল, সে গড়গড় করে বাংলা পড়ে দিতে পারে। নকুলেশ্বর শহর-গঞ্জ থেকে যাত্রাপালার পুঁথি জোগাড় করে আনে, মতিলাল সেগুলো পড়ে পড়ে শোনায়। যে-পালাটি পছন্দ হয়, সেটির পার্ট বিলি হবার পর মতিলালের সাহায্যেই শুরু হয় মুখস্থ করা। কিন্তু শুধু মুখস্থ করলেই তো হল না, নকুলেশ্বর তাদের ভাব শেখায়, ক্রোধ কিংবা কান্না, দুটোই সে ভাল ফোটাতে পারে।

নকুলেশ্বরের দলটি ইদানীং বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ যে প্রধান ফিমেল পার্ট করত, সেই গুপী কর্মকার এই কয়েক মাস হল তাহের দস্তিদারের দলে যোগদান করে চলে গেছে। কীসের টানে যে সে দলবদল করল, তা এখনও জানা যায় না। তাহের দস্তিদারের দল শুধু কুষ্টিয়াতেই আবদ্ধ থাকে না। তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ায়। এই তো এখন তারা রয়েছে খুলনার বাগের হাটে।

দাসপাড়ার লালু নামের ছোকরাটি কোনও কর্মের না। ঘাটে-অঘাটে আর বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, যাতে দু'পয়সা রোজগার হয়, তাতেও তার মন নেই। ধান রোয়ার সময় কিংবা কাটার সময় কেউ তাকে মাঠের কাজেও নেয় না, কারণ সে নির্ভরযোগ্য নয়, কবে সে আসবে আর কবে ডুব দেবে, তার কোনও ঠিক নাই যে! বৃষ্টির মধ্যে জ্বরজারি গায়ে নিয়েও আসতে পারে। আবার দিব্যি খটখটে শুখার দিন, লালুর অসুখ হয়নি, বাড়িতেও বসে নেই। তবু সে কাজে আসে না। হয়তো দেখা যাবে নদীর ঘাটে হাঁটুতে থুতনি দিয়ে সে বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এখানে বসে কী করছিস রে লালু? জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসে।

দুই যাত্রার দলের অধিকারীই তাকে দলে টানার চেষ্টা করেছে, লালু কিছুতেই রাজি হয় না। প্রস্তাব শুনলেই সে দৌড়ে পালায়। আর দু'তিনদিন তার দেখাই মেলে না, কোথায় লুকিয়ে থাকে কে জানে!

তার বিশেষ বন্ধু-বান্ধব নেই। শত্রুও নেই। নির্বিরোধী মানুষ। উপার্জনে মন নেই, কিন্তু প্রয়োজনে মিনি মাগনায় অন্যের উপকারের কাজে লাগতে পারে। গত বর্ষায় যখন হঠাৎ বন্যা হল, ভেসে গেল বাড়ি-ঘর, তখন এই লালুই তো কাঁধে করে ছোট ছোট শিশু আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পৌঁছে দিয়েছে বাঁধের ওপর। এই সব সময়ে সকলেই নিজের নিজের সংসার আর ঘটি-বাটি সামলাতে ব্যস্ত থাকে, কে আর পরের কথা ভাবে। বলতে গেলে এ গাঁয়ে একমাত্র লালুই নিজের বাড়ির কথা ভাবেনি, অন্যদের বাঁচাবার জন্য পরিশ্রম করেছে অসুরের মতন। শিবু গড়াইয়ের মা ফুলু ঠাকুরানির বিশাল বপু, এক শরীরে তিন মানুষের ওজন, তিনি তো ডুবেই মরতে

বসেছিলেন, তাঁর ছেলেরাও তাঁকে ফেলে পালিয়েছিল, লালুই তাঁকে ঘাড়ে নিয়ে কোমর-জল ঠেলে পৌঁছেছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ফুলু ঠাকুরানি সবাইকে ডেকে ডেকে বলেন যে, ওই লালুই তাঁর আসল পোলা, আগের জন্মে সে আপন গর্ভের সন্তান ছিল!

ফুলু ঠাকুরানি মাঝে মাঝেই লালুকে ডেকে সামনে বসিয়ে মোয়া-নাড়ু খাওয়ান, তবে অনেক সময় সে ডাকলেও আসে না। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তার লোভ নেই। কেউ তার প্রশংসা করলে লজ্জা পায়, সরে যায় সেখান থেকে।

বন্যার সময় লালুর নিজের বাড়িও ভেঙে পড়েছিল। সামান্য মাটির বাড়ি। খড়ের চাল। বেশি ঝড়-বাদলের দাপট সহ্য করতে পারে না। প্রতি বছরই নতুন করে দেওয়াল তুলে ছাউনি দিতে হয়। তা এক হিসেবে ভালই, প্রতি বছরই নতুন বাড়ি! এবারে বন্যার পর প্রতিবেশীরাও হাত লাগিয়েছে, ভিতরটা বাড়িয়ে বড় করা হয়েছে ঘরখানা, সামনে একটা দাওয়া। শিবু গড়াই ও আরও কয়েকজন বাঁশ ও খড় দিয়ে সাহায্য করেছে বিনামূল্যে।

লালুর মা বেশ সবলা রমণী। শরীর-স্বাস্থ্য পেটাই করা, মনেরও জোর আছে তেমনি। অল্প বয়সে শিশু সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। বিধবার প্রধান শত্রু তার যৌবন। শরীরে যদি রূপ থাকে, তা হলে তো কথাই নেই, শুধু স্বাস্থ্য ভাল হলেই তার প্রতি অনেকের নজর পড়ে। হিন্দু বিধবাকে কেউ বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু তাকে কুপথে টানার জন্য মানুষের অভাব হয় না। পদ্মাবতী ধর্মশীলা রমণী, অল্প বয়স থেকেই নানারকম ব্রত পালন করেন, তিনি শত প্রলোভনেও সাড়া দেননি। তাতেও কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়? যাকে ভোগ করতে পারে না, পুরুষরা তার ওপর শুরু করে অকথ্য অত্যাচার।

অনাত্মীয়দের এই সব অত্যাচার ও শরিকদের শত্রুতায় অতিষ্ঠ হয়ে পদ্মাবতী একদিন কোলের সন্তানকে নিয়ে স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আশ্রয় নিলেন এসে চাপড়া গ্রামের পিত্রালয়ে।

কায়স্থ পরিবারে মেয়েদের মোটা পণ দিয়ে বিয়ে দিতে হয়। আর সে বিয়ে মানেই জন্মের মতন পার করে দেওয়া। তার মধ্যে যদি সে মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে, তবে সে গলগ্রহ ছাড়া আর কী? কে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে সারা জীবন? তাছাড়া যুবতী দশা থাকলে তো তাকে নিয়ে বিপদের শেষ নেই। বাড়ির পুরুষরাই তাকে নষ্ট করতে চেয়ে নিজেরাও নষ্ট হয়।

পদ্মাবতীর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি এই বিধবা কন্যাটিকে আগলে রেখেছিলেন, কিন্তু বছর চারেকের মধ্যেই তাঁর দেহান্ত হয়। ততদিনে বাবা অন্ধ এবং অথর্ব, পরিবারের সব দায়িত্ব বড় ভাইয়ের ওপর। তাঁর স্ত্রী প্রথম থেকেই পদ্মাবতী ও তাঁর সন্তানকে সুনজরে দেখেননি, পরিবারের কর্ত্রী হবার পর তিনি শুরু করলেন নানা ধরনের নিপীড়ন। তাঁর ছ'টি সন্তান, তারা ফেনা ভাতে ঘি খায়, লালুকে দেওয়া হয় না। তারা দুধ খায়, লালু খায় পিটুলি গোলা। তারা খায় মাছের মুড়ো, লালুর পাতে রোজ এক টুকরো মাছও জোটে না। তবু প্রকৃতির কী আশ্চর্য লীলা, সেই ছেলে-মেয়েগুলির চেয়ে লালুর স্বাস্থ্য অনেক ভাল। অন্যরা নানান রোগে ভোগে, লালুর কিছুই হয় না।

অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠল পদ্মাবতীর বড় ভাইয়ের প্রথম সন্তানের বিয়ের পর। পরিবারে একজন নতুন মানুষ এসেছে, তাকে নিয়ে কত আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দে পদ্মাবতী ও লালুর কোনও অংশ নেই। বরং ছেলে-বউয়ের জন্য বেশি জায়গা লাগবে, এই অছিলায় পদ্মাবতীদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে স্থান করা হল গোয়ালঘরের পাশে এক মাচার তলায়।

পদ্মাবতী নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মসম্মান জ্ঞান হারাননি। তিনি বুঝলেন, এবার তাঁকে বাপের বাড়ির মায়াও কাটাতে হবে। এর মধ্যে লালুর ষোলো বছর বয়স হয়ে গেছে, জোয়ান পুরুষেরই মতন দেখায়, মা আর ছেলে এখন অন্য জায়গায় দিব্যি থাকতে পারবে।

কিন্তু যাবেন কোথায়? সম্বল কিছু নেই। তবে পদ্মাবতী দু'চারবার এদিক ওদিক ঘুরে জেনেছেন যে, দাসপাড়ায় নতুন বসতি গড়ে উঠছে। এমনিতে পতিত জমি, আদাড় পাদাড়, সেখানে দু'চারজন নমঃশূদ্র ঘর তুলছে। কার জমি কে জানে, কেউ তো আপত্তি করে না। এই অঞ্চলটাও ঠাকুরদের জমিদারির মধ্যে পড়ে, কিন্তু তাদের কোনও গোমস্তা, কর্মচারী এদিকে আসে না কখনও।

একজোড়া তালগাছের ধারে একটা জমি পদ্মাবতীর মনে মনে বেশ পছন্দ হল।

এই সময় একটাই ভুল করলেন পদ্মাবতী। বড় ভাইয়ের পরামর্শে লালুর একটা বিয়ে দিয়ে দিলেন। বড় ভাইয়ের ছিল পণের টাকার প্রতি লোভ, আর পদ্মাবতীও ভেবেছিলেন ছেলের বিয়ে দিয়ে কিছু টাকা পেলে সেই টাকায় ঘর তুলতে পারবেন। কিন্তু পণের টাকাও পেলেন মাত্র কিছুটা অংশ, আর তাড়াহুড়োর মধ্যে ঠিক মতন পাত্রী দেখা হল না। পুত্রবধূ করে যাকে ঘরে আনলেন, সে ঠিক কালা-বোবা না হলেও অনেকটা হাবার মতন। দু'চারটের বেশি কথাই বলতে চায় না, সম্ভবত বেশি কথা জানেও না। আর সবসময়েই তার ভয়। যে-কোনও শব্দ হলেই ভয়ে কাঁপে। ঝড়ের মধ্যে বাজ পড়লে সে কেঁদে কেঁদে ভুঁয়ে গড়ায়। এমনকী পাকা তাল পড়ার টিপ শব্দ হলেও সে উরে বাবারে বলে ওঠে।

যা হোক, সেই বউকেও মানিয়ে নিয়েছেন পদ্মাবতী। বউয়ের নাম গোলাপি, সে বেশি কথা বলে না বটে, ঝগড়াও তো করে না। শাশুড়িদের তো সেটাই প্রধান আশঙ্কা থাকে।

বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার পর দাসপাড়ায় ঘর তুলে পদ্মাবতী মোটামুটি শান্তিতেই আছেন। লালুর উপার্জনের ধান্দা নেই, কাজকর্মে মন নেই। কেমন যেন বাউন্ডুলে আর উদাসী স্বভাবের হয়েছে। তাতেও তিনি বিচলিত নন। ছেলে যে অসৎ প্রকৃতির হয়নি, সেটাই যথেষ্ট। সে বাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যায় না, মাকে ভালবাসে-ভক্তি করে, বউকেও অবহেলা করে না। পদ্মাবতী নিজেই লোকের বাড়িতে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভেজে আর মুড়ি-চিঁড়ে ভেজে যা রোজগার করেন, তাতেই পেট চলে যায়। বউও ঘরে বসে বড়ি দিতে পারে, কাসুন্দি, তেঁতুলের আচার বানাতে পারে, তাতেও কিছু আয় হয়। মানুষ একেবারে অনাহারে থাকলে শান্তি পায় না, কিন্তু দু'বেলা যদি মোটামুটি অন্ন জুটে যায়, তাহলেই ইচ্ছে করলে সুখী হওয়া যায়। এতদিন পর নিজস্ব একটা সংসার পেয়ে পদ্মাবতী প্রকৃত সুখী। হাট থেকে একটা রাধাকৃষ্ণের পট আর লক্ষ্মীর সরা কিনে সাজিয়ে রেখেছেন ঘরের কোণে। প্রতিদিন সন্ধেবেলা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কয়েকবার শাঁখে ফুঁ দেন তিনি, তারপর ধূপ জ্বালিয়ে বসেন সেই রাধাকৃষ্ণের পট ও লক্ষ্মীর সরার সামনে, কিছুক্ষণ থাকেন চোখ বুজে, মন্ত্র-টন্ত্র কিছুই জানেন না, কী ভাবেন কিংবা কী চিন্তা করেন কে জানে। তখন মুখে ফুটে ওঠে অপূর্ব তৃপ্তির ছায়া।

সন্ধ্যার পর লালু বাড়ি ফিরলে খেতে বসার আগে সেই পট ও সরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। গুনগুন করে কিছু একটা গান গায়।

যাত্রা দলে যোগ দিতে রাজি হয়নি লালু। কিন্তু হাটখোলায় মহড়ার সময় সে এক পাশে বসে থাকে। কিছু বলে না, মন দিয়ে সব শোনে। সব পালাতেই অন্তত সাত-আটখানা গান থাকে, সেই সব গান তার মুখস্থ হয়ে যায়। তার কণ্ঠেও বেশ সুর আছে। দু'-চারজন তার গান শুনে ফেলেছে। কুষ্টিয়া-নদিয়ায় নানা সম্প্রদায়ের গানের আখড়া আছে। এ অঞ্চলে অনেকেরই মুখে মুখে গান ফেরে। লালু যাত্রাদলে যদি অভিনয় করতে না চায়, শুধু গান গাইলেও তো পারে। তাও সে রাজি হয় না।

শুধু একবার নকুলেশ্বরের দলের গৌর-নিতাই পালার সময় মূল গায়েন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন আর উপায় অন্তর ছিল না। তাকে প্রায় জোর করেই গানের দলে বসিয়ে দেওয়া হয়। মোট তিনখানা গান সে গেয়েছিল, তাকে প্রশংসাই করেছিল দলের লোকেরা, স্বয়ং নকুলেশ্বর তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পালা সাঙ্গ হবার পর লালুর সে কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। সবাই অবাক। কেন কাঁদছে, কী হয়েছে, তা প্রথমে সে কিছুতেই বলতে চায় না। তারপর সে জানাল যে, সে তিনটি গানেই সুর ভুল করেছে, সেই জন্য তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে! সবাই তা শুনে হেসেছিল, একজন বলেছিল, তুই কি মিঞা তানসেন হইতে চাস নাকি রে লাউল্লা!

এক সন্ধেবেলা মহড়ার সময় কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বাড়ির পাহারাদার যদু এসে জিজ্ঞেস করল, দাসপাড়ার লালুরে কোথায় পাওয়া

যাবে কইতে পারো? বাড়িতে সে নাই।

একজন বলল, ওই তো দ্যাখেন খুঁটিতে হেলান দিয়া বইস্যা আকাশ দ্যাখতাছে।

যদু দেখল, দূরে এক কোণে একটা দোকানের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে লালু।

তার সামনে গিয়ে যদু বলল, চল, আমাগো কত্তামশাই তোরে এত্তেলা দিচ্ছেন।

লালু কয়েক মুহূর্ত যদুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সে ওর কথা শুনতে বা বুঝতে পারেনি। যেন সে এ জগতে ছিল না।

তারপর ঘোর ভেঙে বলল, কারে ডাকছে কইলা? আমারে?

যদু বলল, হ, হ, তোরে। এহনি যাইতে কইছে।

মহড়া ছেড়ে অনেকে উঠে এসেছে কৌতূহলী হয়ে। কবিরাজমশাইয়ের মতন একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ লালুর মতন একজন এলেবেলেকে ডাক পাঠাবেন কেন?

মাসখানেক আগে লালু যে ওই বাড়িতে চোর হিসেবে ধরা পড়েছিল, সে খবর অস্পষ্টভাবে কয়েকজনের কানে এসেছে। কেউ বিশ্বাস করেনি। চোর হতে গেলেও একপ্রকার দক্ষতা লাগে। লালুটা তো একেবারেই ট্যালা।

অতবড় একজন মানুষের ডাক অবহেলা করার কোনও উপায় নেই। লালুকে যেতে হল যদুর সঙ্গে।

কবিরাজমশাই তখন তার বাড়ির সামনের দিকে চাতালে সপার্ষদ বসে আছেন। আজ আর তাঁকে রুগি দেখতে যেতে হয়নি। সন্ধ্যার আকাশে অজস্র তারা ফুটেছে, মৃদু মৃদু বাতাসে স্নেহ স্পর্শ। হুঁকোয় কয়েক টান দিয়ে কবিরাজ সেটি পাশের একজনকে দিলেন। ব্রাহ্মণের হুঁকো আলাদা। কবিরাজ মীর মহম্মদ নামে এক দোস্তের সঙ্গে প্রায়ই দাবা খেলতে বসেন, তাঁর জন্যও পৃথক হুঁকো রাখা থাকে।

লালু হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

মাসখানেক কেটে গেছে, তবু এই বিচিত্র চোরটির কথা কবিরাজমশাই ভুলে যাননি। তার নামও মনে রেখেছেন।

কবিরাজ বললেন, কি রে, আর কোনও গৃহস্থবাড়িতে চুরি-টুরি করতে যাস নাই তো?

এই সব মানুষের সামনে এলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। লালু দীনকণ্ঠে বলল, না, কর্তা।

কবিরাজ বললেন, বেশ, বেশ। বলেছি না, তোর একটা বড় ফাঁড়া আছে। যদি বাঁচতে চাস তো সাবধানে থাকবি। তুই নাকি গান করোস?

লালু মাথা নিচু করে রইল। কোনওরকম কথায় প্রতিবাদ করলেই তা অতিবিনয় বলে মনে হবে।

কবিরাজ বললেন, একখান গান শোনা। তুই রামপ্রসাদের গান জানিস?

এবারে মুখ তুলে লালু বলল, না, কর্তা। আমি গান শিখি নাই।

কবিরাজ বললেন, 'দে মা আমায় তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী', অহো, বড় মনোহর গানখানি রচেছে। তুই যা জানোস, সেই গানই একখান গা।

প্রতিবাদ না করে লালু একটা যাত্রার গান ধরল, 'ভবনদী পার হবি কে আর—'।

গান শেষ হবার পর কবিরাজ তাঁর পাশের লোকদের দিকে ফিরে বললেন, মন্দ না, কী বলো তোমরা?

এক বৃদ্ধ বললেন, শুদ্ধস্বর ঠিক লাগে নাই। তার সপ্তকে গলা ওঠে না।

আর একজন বললেন, গান গায় বটে নদের চান্দ। তুই তার গান শুনেছিস?

লালু বলল, না, কর্তা।

কবিরাজমশাই বললেন, শোন, তোরে কেন ডেকেছি। আমার বড় গিন্নির শখ হয়েছে গঙ্গাস্নানে যাবে। আমিও কিছুদিন ধরে ভাবতেছি... যেতে হলে এই বর্ষার আগেই ঘুরে আসতে হয়। গঙ্গা দর্শনের জন্য যেতে হবে সেই বহরমপুরে। দূর আছে। তুই যাবি আমাগো সাথে?

এ প্রস্তাব শুনে লালু কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে রইল। হিন্দু ঘরে জন্ম, বাল্যকাল থেকে গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনে এসেছে। ভূ-ভারতের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যবতী নদী। এ নদীতে একবার ডুব দিলে সব পাপ হরণ হয়ে যায়।

জন্মাবধি লালু এই দু'-তিনখানা গ্রাম ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। এর বাইরেও রয়েছে কত দেশ, কত মানুষ। সবই তো দেখতে ইচ্ছে করে। রাত্তিরে চুপি চুপি ঘোড়ায় চেপে সে মনে মনে কত অচেনা দেশে চলে গেছে।

তারপরই তার বাস্তববোধ ফিরে এল। সে বলল, কর্তা, আমার তো পয়সাকড়ি নাই, অত দূর দেশে যাব ক্যামনে!

কবিরাজ বললেন, পয়সাকড়ি নাই, শরীরে তো তাগত আছে। তুই পালকি বইতে পারবি?

কোনওদিন তো ও কাজ করি নাই।

তাইলে পারবি না। শিখতে লাগে। শোন, আমি তো পালকিতে যাব না, পা গুটায়ে বসতে পারি না, মাজায় ব্যথা হয়। ঘোড়ার পিঠেই আমার সুবিধা। এতখানি পথ, যাতায়াতে দিন পনেরো তো লাগবেই। এই পনেরো দিন মানিকচাঁদকে তো খিদমত করা লাগবে। তুই ঘোড়া ভালবাসোস, তুই এই কাজ পারবি। তুই আমার লগে লগে যাবি, যেখানে থামব, সেখানে তুই মানিকচাঁদরে দানাপানি খাওয়াবি, তোর কোনও রাহা খরচ লাগবে না। যাবি?

অবশ্যই। যদি দয়া করেন।

এই মঙ্গলবারই যাত্রা। শুভদিন আছে। দ্বিপ্রহর দুইটা বেজে এগারো মিনিটে গমন শুরু। তুই সকাল সকাল তোর পোঁটলাপুঁটলি যা থাকে নিয়ে চলে আসবি। দুই তিনখান গান শিখে নে এর মইধ্যে। আমারে গান শুনাবি। আর একটা কথা মনে রাখবি, মানিকচাঁদরে চাঙ্গা রাখাই তোর আসল দায়িত্ব।

লালু ফেরার পথ ধরল প্রায় নাচতে নাচতে। এত আনন্দের সংবাদ সে বহুদিন শোনেনি।

বহরমপুর কত দূর সে জানে না। গঙ্গা নদীরই বা কেমন রূপ? এই নদী নাকি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কোথায় আছে হিমালয় পাহাড়, সেখানে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মহাদেব এই নদীকে নিজের জটায় ধারণ করেছেন। 'পাণ্ডব বিজয়' নামে একটা পালায় এই সব জেনেছে লালু।

মনে মনে সে চলে যাচ্ছে বহরমপুরে। সেখানকার গাছপালা সব অন্যরকম। পথের দু'ধারের গাছে গাছে কত ফল ফলে আছে, তার একটাও সে চেনে না। কতরকম পাখি, তাদের কণ্ঠে কতরকম সুর। বহরমপুর, বহরমপুর, সে স্থান স্বর্গের খুব কাছে!

৩

লালুর স্ত্রী গোলাপির মতামতের কোনও প্রশ্নই নেই, তার স্বামীর এখানে থাকা বা না-থাকার যে কী তফাত, তা যেন তার মাথাতেই ঢোকে না। বেচারি দুর্বল মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে, যখনই সে কিছু বুঝতে পারে না, সে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকে, তারপর তার মুখে ফুটে ওঠে ভয়ের ছাপ।

পদ্মাবতী এ সংবাদ শুনে আঁতকে উঠলেন। অনেকদিন ধরেই তাঁর মনে মনে এরকম একটা আশঙ্কা ছিল। লালুর বাবা মাধব কর যৌবন বয়সেই সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। হিন্দু পল্লীর শ্মশান স্থানে মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমাণ সাধুরা আস্তানা গড়ে, সেই সাধুদের কাছে বসে থাকতেন মাধব। সাধুদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ছিল তাঁর খুব কৌতূহল। সাধুদের পদসেবা করে উনি সেই রকম কিছু শিখতে চাইতেন। একদিন তিনি উধাও হয়ে গেলেন, কোনও সাধুর সঙ্গ নিয়েছেন বলেই ধরে নেওয়া হল। স্ত্রী-পুত্রের কথা চিন্তা করলেন না, সংসারের দায়িত্ব ভুলে গেলেন কিসের টানে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় পাঁচ বছর পর। এর মধ্যে আর তিনি ঘরমুখো হননি। এক সাধুর চেলা একটা মাটির সরায় ছাই এনে বলেছিল, সেটাই তাঁর চিতাভস্ম। সেই কথা বিশ্বাস করে তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়েছিল।

পদ্মাবতীর চিন্তা ছিল, তাঁর ছেলেও যেন তাঁর স্বামীর ধারা না পায়।

সেই জন্যই তিনি লালুকে কখনও জীবিকা অর্জনের জন্য তাড়না করেননি। সে নিজের মনে থাকতে চায় থাক। ঘর না ছাড়লেই হল।

এবার সে অতদূরে যাবে, যদি না ফেরে? পদ্মাবতী কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু লালু যাবেই। যাত্রার দিন পদ্মাবতী দৌড়তে দৌড়তে এলেন ছেলের সঙ্গে। আছড়ে পড়লেন কবিরাজমশাইয়ের পায়ে। কবিরাজ তাঁর কথায় বিশেষ কান দিলেন না। খানিকটা ধমক দিয়েই বললেন, শোনো বাছা, ছেলের বয়স ঢের হয়েছে। এত বড় ছেলে তার মা-বাপের ইচ্ছাতে চালিত হয় না। নিজের ভাল-মন্দ বুঝে নেয়। বেশি বাধা দিলে তেরিয়া হয়ে যায়। আমার সঙ্গে যাবে, আমার সঙ্গেই ফিরে আসবে, এতে চিন্তার কী কারণ আছে? পথে অসুখ-বিসুখ হলে, আমিই তো আছি। ওষুধপত্তর দেব। তবে ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে সাপের কামড়েও তো মানুষের মৃত্যু হতে পারে, পারে না?

সম্প্রতি গোসাঁই পাড়ায় এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। প্রতি বছরেই বর্ষার সময় এ অঞ্চলে দু-চারজনের প্রাণ যায় সাপের বিষে। ওলাউঠায় একেকটা পল্লীই সাবাড় হয়ে যায়। এ সবই নিয়তির লিখন।

শুভক্ষণে শুরু হল যাত্রা।

চারদিক ঘেরা পালকিতে বড় গৃহিণী, গ্রামের আরও তিনজন মাতব্বর পদব্রজে, কবিরাজ মশাই ঘোড়ায়, আর পিছনে পিছনে পাহারাদার যদু ও তল্পিবাহক লালু।

কয়েকখানা গ্রাম পার হবার পরই লালুর সব কিছু অন্যরকম লাগে। বাতাসও যেন অন্য স্বাদের। পুকুরের জল বেশি মিষ্টি মনে হয়। আকাশে মেঘের নতুন নতুন ছবি ফোটে।

কয়েক মাস একটানা গ্রীষ্মের পর এখন মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়। পুরোপুরি বর্ষা নামতে আরও কিছুদিন দেরি আছে। দূরে কোথাও যাওয়ার জন্য এটাই সঠিক সময়। রাত্রে অত বেশি গরম লাগে না। শীতকালটাও ভাল ঠিকই, কিন্তু শীতের সময় লেপ-তোষক বহন করতে হয়। গাছতলায় কিংবা উন্মুক্ত স্থানে শোওয়া যায় না। তাতে শীতল বাতাসে সান্নিপাতিক রোগ হতে পারে।

প্রথম রাত্রিটি এই অভিযাত্রীর দল কাটাল এক গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে। নানান কার্য কারণে কিছু মানুষকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করতেই হয়। সরাইখানা কিংবা রাত্রিবাসের ব্যবস্থা বেশ দুর্লভ। কোনও কোনও গৃহস্থ বাড়িতে আশ্রয় চাইলে পাওয়া যেতে পারে। অনেকেই মনে করে অতিথির সেবা পুণ্য কাজ। দল বেঁধে গেলে অবশ্য সে সুযোগ নেওয়া হয় না। যে যার ধর্ম অনুযায়ী মন্দির বা মসজিদের চাতালেও শুয়ে থাকা যায়। চণ্ডীমণ্ডপ বা মাদ্রাসাগুলিও এ জন্য উন্মুক্ত।

সঙ্গে আনা হয়েছে চাল, ডাল, আলু ও লবণ। অস্থায়ী উনুনে ফুটিয়ে নেওয়া হয় ভাত। চারজন পালকিবাহক, যদু ও লালুর জন্য রান্না এক হাঁড়িতে। অন্য হাঁড়িতে কবিরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের। লালন মানিকচাঁদকে খেতে দেয় ও দলাইমলাই করে। মানিকচাঁদের হ্রেষার শব্দ শুনেই বোঝা যায় সে বেশ তৃপ্তিতে আছে।

এই সময় নদীনালায় জল বেশি থাকে না। বর্ষার সময় যেসব মাঠ ও পায়ের চলা পথ ডুবে থাকে, এখন সেগুলি জেগে ওঠে। তবু জলপথ এড়িয়ে স্থলপথে বহরমপুরে যাবার জন্য অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। অন্য দু-একটি গ্রামে কবিরাজমশাইয়ের কিছু আদায়পত্তরের কাজ আছে। তাঁর সঙ্গীরাও এই সুযোগে অন্য গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের কুশলসংবাদ নিয়ে যেতে চান, তাই একটু ঘুরপথ হয়।

খোকসা, কুমারিখাল, ছেঁউড়িয়া, শিলাইদহ পার হবার পর এই যাত্রীর দল এসে পৌঁছল যশোরে। লালুর এই প্রথম নগর দর্শন। সার সার পাকা বাড়ি, মাটির রাস্তার বদলে ইট বাঁধানো রাস্তা দেখে সে মোহিত হয়ে যায়। তারপরই সে ভাবে, এ সবই তো মানুষের তৈরি! তবে, শহরের মানুষ আর গ্রামের মানুষ কি আলাদা?

প্রকৃত আলাদা মানুষও লালু দেখতে পেল। শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী। ঘোড়ায় টানা গাড়িও লালু আগে দেখেনি। সাহেব-মেমদের গায়ের রং মুলোর মতন, কারুর কারুর মাথায় চুল লাল। সাহেব ও মেমরা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে হাঁটে। তাদের হিন্দু, মুসলমান বাড়ির মেয়েরা তো এমন ভাবে পথ দিয়ে হাঁটে না।

রাস্তার ধারে টিনের চালায় পরোটা আর কীসের যেন তরকারি বিক্রি হয়, ঘিয়ের গন্ধ ম ম করে। কিছু লোক সেখানেই বসে বসে খায়। সামনে কয়েকটা কুকুর জিভ বার করে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে। ধুলো উড়িয়ে সাহেব-মেমদের জুড়ি গাড়ি চলে যায়, তখন দিশি লোকদের পালকি এক পাশে সবে দাঁড়ায়।

যশোরে এক রাত্রি কাটিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা। এখানে দু'-একজন পরামর্শ দিয়েছিল যে, বহরমপুরের বদলে মুর্শিদাবাদ শহরেও যাওয়া যায়, সেখানেও গঙ্গা পাওয়া যাবে। আবার কয়েকজন সাবধান করে দিল যে, মুর্শিদাবাদে নবাবি আমলের পতনের পর এখনও অরাজকতা চলছে, পথেঘাটে দস্যু-তস্করের উপদ্রব খুব বেশি। বহরমপুরে ইংরেজদের ঘাঁটি আছে, তারা আইন-শৃঙ্খলা কিছুটা রক্ষা করে।

এই সময় পথে আরও তীর্থযাত্রীদলের সাক্ষাত মেলে। দল যত ভারী হয়, ততই মঙ্গল। সব বড় বড় দলেই একাধিক পাহারাদার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরও লাঠি ধরতে হয়। লালুকেও যদু লাঠি খেলা শিক্ষা দেয় রোজ। সন্ধ্যার সময় যাত্রা বিরতি হলে কিছুক্ষণ যদুর সঙ্গে লালুকে লাঠির পাল্লা দিতে হয়।

অন্য একটি দলে ডুলিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে। এঁর গঙ্গা যাত্রা হবে। পবিত্র গঙ্গা নদীতে পা ডুবিয়ে রাখা অবস্থায় কারুর মৃত্যু হলে তাঁর আত্মা সরাসরি স্বর্গে চলে যায়।

কবিরাজমশাই সেই রুগির একবার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখে এলেন। তারপর ফিরে এসে নিজের সহচরদের কাছে হাসতে হাসতে বললেন, কী দেইখ্যা আসলাম বল্‌তো? ওই বুড়ার এখন মৃত্যুযোগ নাই, বায়ু আর পিত্ত প্রবল, কিন্তু আয়ু আছে অন্তত আরও তিন-চার মাস। একবার গঙ্গাযাত্রা করালে তো ফিরিয়ে আনার নিয়ম নাই। ও বুড়ার সঙ্গীরা বিপদে পড়ে যাবে। তিন-চার মাস বসে থাকতে হবে গঙ্গার ধারে।

বৃদ্ধের দলে চারজন রমণীও আছে, নানা বয়সের। চারজনই ওই বৃদ্ধের ধর্মপত্নী। তাঁদের হাতের শাঁখা ও সিঁথির সিঁদুর আর কতদিন থাকবে, তা নির্ভর করছে বৃদ্ধের আয়ুর ওপর। তারপর বাকি জীবন সহ্য করতে হবে বৈধব্য যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে ওই চার রমণী কী নিয়ে যেন ঝগড়া শুরু করে।

নদী-নালা এড়িয়ে এড়িয়ে চললেও এক জায়গায় একটি ছোট নদী পার হতেই হল।

তবে এ নদীতে জল বেশি নেই, অল্প অল্প স্রোত আছে। আগে যদু একবার ওপার পর্যন্ত গিয়ে ফিবে এল। হাঁটু জল, মাঝখানটায় কোমর সমান। গিরিবালা পালকি থেকে নামলেন না। দিনেরবেলা তিনি অন্য লোকদের মুখ দেখান না। কাহাররা জানাল যে, গিন্নীমাসমেত তারা পালকি ওপারে নিয়ে যেতে পারবে। কবিরাজমশাই ঠিক করলেন, তিনি ঘোড়া থেকে নেমে নিজে পার হবেন, অন্যদেরও সেইভাবেই যেতে হবে। লালুর ওপর ভার পড়ল, মানিকচাঁদকে সে পার করাবে।

সবার শেষে লালুর পালা। মানিকচাঁদ কিছুতেই জলে নামতে চায় না। তার লাগাম ধরে টানাটানি করলেও সে সিঁটিয়ে থাকে। অন্য দলের দু'জন লোক পেছন থেকে তাকে জোর করে ঠেলে দিল। জলে নেমেও দাপাদাপি করতে লাগল মানিকচাঁদ। ঘোড়ার মতো প্রাণীরা জলে ডুবে যায় না, তবু কেন সে এত ভয় পাচ্ছে কে জানে।

মাঝ নদীতে গিয়ে মানিকচাঁদ এত লাফালাফি করতে লাগল যে, লাগামটা ধরে রাখাই শক্ত হল লালুর পক্ষে। সে হাবুডুবু খেতে লাগল, কিন্তু লাগাম ছাড়ল না। অন্যরা ওপারে পৌঁছে গেছে, তারা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

এরই মধ্যে লালু দেখল তার পাশে একজন মানুষ। জলে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে তার গায়ে। এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। বেশি বয়স নয়, তিরিশ-বত্রিশ হবে, সারা মুখ ক্ষতবিক্ষত, কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে কে জানে। দাহ না করে বা কবর না দিয়ে কেউ ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। লালু আস্তে সেই রমণীকে সরিয়ে ভাসিয়ে দিল স্রোতে।

অতিকষ্টে মানিকচাঁদকে অন্য পারে তোলার পর কবিরাজমশাই লালুর পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, সাবাস! লালু, তোর কথা মানিকচাঁদ এত শোনে, তবু তোর সঙ্গেও জলে নামতে চাইছিল না, তা হলে অন্য কেউ
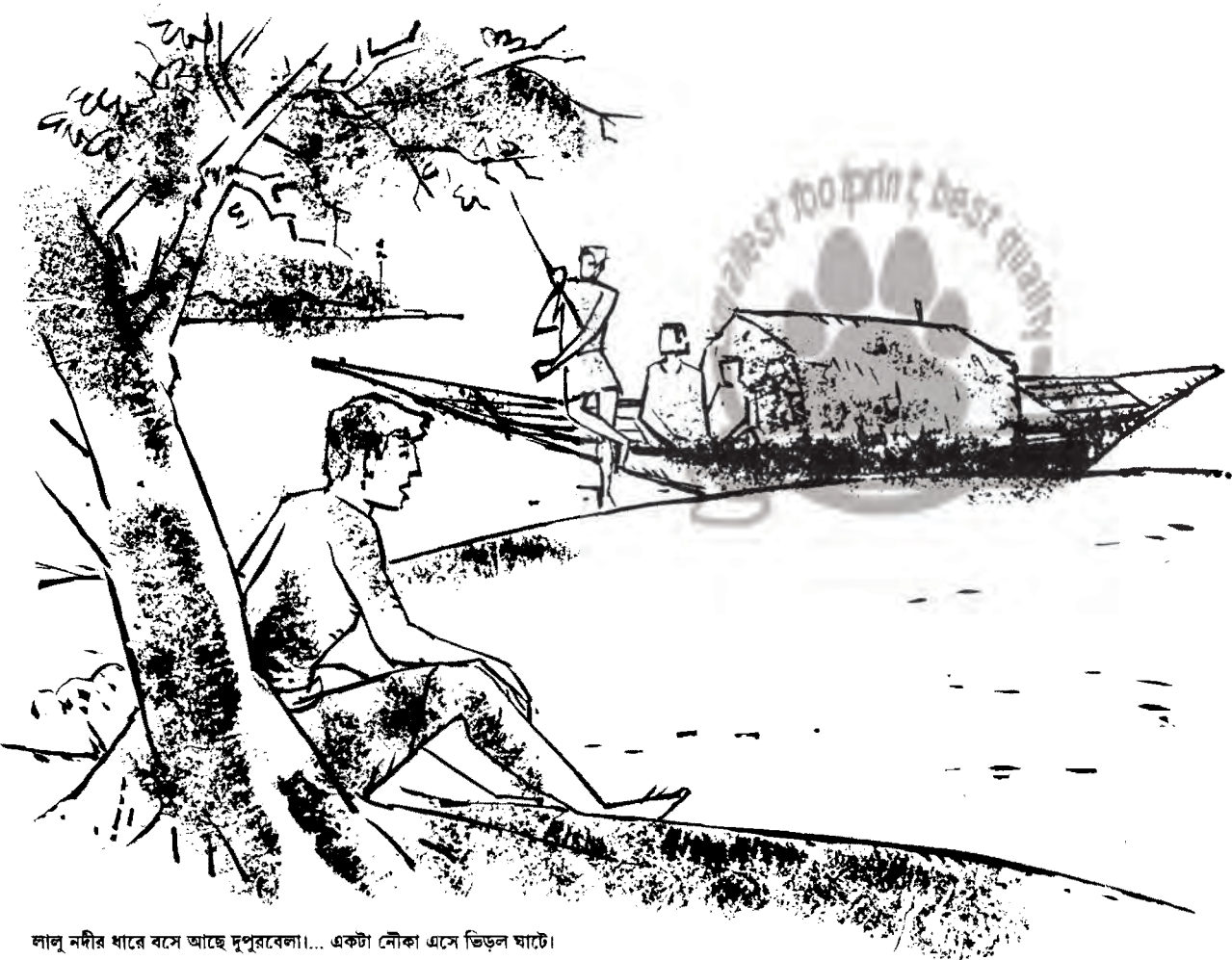
লালু নদীর ধারে বসে আছে দুপুরবেলা।... একটা নৌকা এসে ভিড়ল ঘাটে।

তো ওকে বাগে আনতেই পারত না!

তারপরই কবিরাজ একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, তোর গা টা গরম গরম লাগল কেন রে লালু? জ্বর হয়েছে নাকি?

লালু একটু সরে গিয়ে বলল, না, না, কর্তা, ও কিছু না।

আগের রাত থেকেই লালুর গায়ে জ্বর। সে কারুকে কিছু জানাতে চায় না। সে রাত্রে তার আরও জ্বর বাড়ল, তবু মুখ বুজে রইল লালু। তারপর বহরমপুর পৌঁছবার যখন আর বিশেষ দেরি নেই, আর একদিনের পথ, তখন লালুর ধুম জ্বর, সারা শরীরে জ্বালা, পা দুর্বল হয়ে গেছে, চক্ষেও ঝাপসা দেখছে। তবু তার মধ্যেও হাঁটার চেষ্টা করতে করতে এক সময় পড়ে গেল পথের পাশে।

কবিরাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, যদুর ডাক শুনে থামলেন পিছিয়ে এসে, ঘোড়া থেকে নেমে লালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তার একটা হাত ধরে নাড়ি দেখলেন, বললেন, জিভ বার কর।

ওষুধের পেটিকা খুলে বার করলেন খল। মকরধ্বজ ও মধু মিশিয়ে ঘষলেন খানিকক্ষণ, যদুকে বললেন, খানিকটা কলাপাতা জোগাড় কর।

খল থেকে ওষুধ চেটে চেটে খেতে হয়, কিন্তু কবিরাজের নিজস্ব খল তো অন্যকে দেওয়া যায় না। খলের ওষুধ একটুখানি কলাপাতায় ঢেলে বললেন, খা। চিন্তা নেই, জ্বর কমে যাবে।

যদু ধরে ধরে দাঁড় করাল লালুকে। কবিরাজ তার ঘোর লাগা অবস্থা দেখে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুই হাঁটতে পারবি না। ঠিক আছে, তুই ঘোড়ার পিঠে ওঠ, আর বেশি পথ নেই। এটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারব।

এই কথাতেই যেন লালুর ঘোর ভেঙে গেল। চক্ষু মেলে, মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, না কর্তা, আমি পারব, হাঁটতে পারব।

কবিরাজ বললেন, পারবি? তা হলে আস্তে আস্তে আয়।

একটা লাঠিতে ভর দিয়ে কোনওক্রমে হাঁটতে লাগল লালু। সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হাঁটু দুমড়ে আসছে মাঝে মাঝে, তবু সে এগচ্ছে শুধু মনের জোরে।

বহরমপুরে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক মানুষ এখানেই গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করতে আসে। তাই সেইসব যাত্রীদের জন্য এখানে বেশ কয়েকটি চালা ঘর তৈরি করা হয়েছে। অবশ্যই ভাড়া লাগে। কয়েকটি দোকানঘরও গজিয়ে উঠেছে, ভিখারি ও সুযোগসন্ধানীও প্রচুর। স্নানের সময় কেউ কেউ তামার পয়সা জলে ছুড়ে দেয়, মা গঙ্গার প্রতি অঞ্জলি হিসেবে। কিছু কাঙালি ছেলে সেই সব পয়সা ডুবে ডুবে তোলে।

কবিরাজমশাই সস্ত্রীক, সবান্ধব একটি বড় চালাঘরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। বাকিরা পাশের উন্মুক্ত স্থানেই থাকবে। একটু দূরে দূরে কয়েকটি মাটির উনুন তৈরি করাই আছে। সেখানে রান্নার বন্দোবস্ত হতে পারে। কয়েকটি খাবারের দোকানও আছে, ভাত-ডাল পাওয়া যায় না বটে, রুটি-ডালপুরি-হালুয়া যথেষ্ট মেলে, তিন পয়সায় মোটামুটি পেট ভরে। লালু রাত্রে কিছুই খেল না, ঘুমোতে লাগল অঘোরে।

পরদিন সকালে দেখা গেল লালুর সারা গায়ে লাল লাল গোটা বেরিয়েছে।

কবিরাজ তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। তারপর যদু ও পালকিবাহক কাহারদের বললেন, তোরা সরে আয়। ওকে আর ছুঁবি না। এ রোগ বড় ছোঁয়াচে। দুটো কাঙালি ছেলেকে ডেকে আন, আমি ওষুধ দিচ্ছি, ওরা খাইয়ে দেবে। একটা করে পয়সা দেব, ওরাই জলটলও দেবে।

স্নানের পুণ্যলগ্ন এক ঘটিকা থেকে শুরু। ঘাটে থিকথিক করছে মানুষ। কিছু দূরে দুই মুমূর্ষু বৃদ্ধকে জলে পা ডুবিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে। দুপুরের

পর থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল স্নান-উৎসব। অনেক পুরুতও এসেছে, তাদের মন্ত্র-উচ্চারণে কার কত গলার জোর যেন তার পরীক্ষা চলেছে।

লালুর গায়ে একটা চাদর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। তার জ্ঞান নেই। লাল লাল গুটিতে এখন তার মুখও ভরে গেছে।

লালুকে নিয়ে কবিরাজের দলটি খুব অসুবিধেয় পড়ে গেল। স্নান সম্পন্ন হয়েছে, কয়েকটি কলস ভর্তি নেওয়া হয়েছে জল। এরপর আর অপেক্ষা করার তো কোনও মানে হয় না। কিন্তু ছেলেটাকে ফেলে রেখেই বা যাওয়া যায় কী করে?

পুরো দলটিকেই থেকে যেতে হল আরও দু'দিন।

এর মধ্যে লালুর আর জ্ঞান ফিরল না। তার পানবসন্ত হয়েছে। শুধু জলবসন্ত হলে তেমন ভয়ের কিছু থাকে না, পানবসন্ত অতি মারাত্মক। এর কোনও চিকিৎসা নেই। লালুর গায়ে অনেক বেশি গুটি উঠেছে, অন্যদের এত হয় না।

তৃতীয়দিন রাত্রে লালুর গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল, ভোরের দিকে সেই শব্দ কিছুটা মন্থর হতে হতে থেমে গেল এক সময়।

যদুরা গিয়ে কবিরাজমশাইকে খবর দিলে তিনি দেখতে এলেন। লালুর মুখে স্পষ্ট মৃত্যুর ছায়া। শরীরের মাড়ি-গুটিগুলো দগদগ করছে। কয়েকটা মাছি ভন ভন করছে তার চোখের ওপর।

কবিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ছেলেটার কঠিন ফাঁড়া ছিল, আমি আগেই বলেছি। কিন্তু এমন বেঘোরে মৃত্যু হবে তা কে বুঝেছে! সবই নিয়তি। নিয়তি কেন বাধ্যতে!

কাছেই শ্মশান। কিন্তু শীতলা মায়ের দয়ায় যার প্রাণ যায়, তাকে শীতলা মা ছাড়া শ্মশানের চণ্ডালরাও সহজে ছুঁতে চায় না। বেশি পয়সা দিতে হয়।

কবিরাজ বললেন, ছেলেটা এত দূর এল, তবু গঙ্গাস্নানও ওর ভাগ্যে ঘটল না। যদি একবার অন্তত ডুব দিতে পারত!

যদু বলল, কর্তা, ওকে না পুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দিলে হয় না? তাতেও যদি একটু পুণ্য হয়।

কবিরাজ বললেন, প্রাণ না থাকলে আর পুণ্য কী! দে, তাই দে।

লালুর দেহ কে জলের কাছে নিয়ে যাবে? ডাকা হল সেই কাঙালি ছেলে দুটোকেই।

তারা বলল, এমনি এমনি বসন্তের রুগিকে জলে ফেলে দিলে কোতোয়ালি থেকে তাদের ডান্ডা পেটা করা হবে। প্রচুর বুড়োবুড়ি এখানে আসে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অক্কা পায়। খরচের ভয়ে কিংবা অবহেলায় তাদের দাহ না করে জলেই ফেলে দেওয়া হত এতদিন। এখন কোতোয়ালি থেকে তা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। জলে মড়া ভাসে, তাতে স্নানার্থীদের অসুবিধে হয়।

তবে কলার ভেলায় তুলে মাঝ নদীতে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিলে আপত্তির কিছু নেই। তাদের পয়সা দিলে সে ব্যবস্থা করা যাবে।

লালুর দেহ কলার ভেলায় তোলার পর কবিরাজ বললেন, কিন্তু হিন্দুর ছেলে, তার মুখাগ্নি হবে না? নাহলে যে ওর আত্মার মুক্তি হবে না।

তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে বললেন, ওহে দত্তজা, এই কায়স্থর ছেলেটা তো তোমাদের স্বজাতি। তুমিই ওর মুখাগ্নি করে দাও।

তখন একটা চ্যালা কাঠে আগুন ধরিয়ে রাঘব দত্ত সেটা লালুর মুখে ঠেসে ধরে একটু মন্ত্রও পড়ে দিল।

কাঙালি ছেলেরা সাঁতরে সাঁতরে ভেলাটা মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিল স্রোতে। ভেলাটা দুলতে দুলতে মিলিয়ে গেল।

ভারাক্রান্ত মনে কবিরাজমশাই সদলবলে ফিরে চললেন। চারদিন পর গ্রামে পৌঁছে লালুর মাকে দুঃসংবাদ দিতেই হল।

পদ্মাবতী এসে আছড়ে পড়লেন কবিরাজমশাইয়ের বাড়ির উঠোনে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই মায়ের কান্না। কী সান্ত্বনা তিনি জানাবেন? বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিয়ে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য সাধন হয় কে জানে। ভগবানের বিচার নিয়ে তো প্রশ্ন করাও যায় না।

তিনি ধীর স্বরে বললেন, বাছা, মানুষের পক্ষে যতখানি সুচিকিৎসা পাওয়া সম্ভব, তা তোমার ছেলে পেয়েছে। আমি আমার ওষুধে কোনও কোনও রুগিকে যমের দরজা থেকেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, কিন্তু নিয়তির সঙ্গে তো যুদ্ধ চলে না। মা গঙ্গা তাকে গর্ভে নিয়েছেন। তুমি এখন শ্রাদ্ধ-শান্তি করো যাতে পরলোকে গিয়ে তোমার সন্তান শান্তি পায়।

যথা সময়ে পুরোহিত এসে যথাবিহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন এবং ধুতি-গামছা, স্বর্ণালঙ্কার, ফলমূল, আতপ চাল দক্ষিণা নিলেন। বিধবা সর্বস্বান্ত হয়ে এগারোজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেন।

তার পর লালুর নাম মুছে গেল। গ্রামের জীবন আগেকার নিয়ম মতনই চলতে লাগল, বিধবা জননীর চোখের জলও শুকিয়ে গেল এক সময়। পুত্রবধূটি কী বুঝল আর কী বুঝল না, তা সে নিজেই জানে।

দু'জনেই আবার শুরু করে দিল ঘরকন্নার কাজ। তাদের তো বেঁচে থাকতে হবে।

৪

কলার ভেলার ওপর শবদেহটি ভাসতে ভাসতে চলল। কখনও আটকে যায় কচুরিপানায়। কখনও সাহেবদের কলের জাহাজ ভোঁ বাজিয়ে গেলে বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সরে যায় পাড়ের দিকে।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে সেই কলার ভেলা এসে ঠেকল একটা মস্ত বড় গাছের শিকড়ে। সেখানে নদীর পাড় ভাঙছে, গাছটির গুঁড়ির কাছেই ছলাত ছলাত করছে ঢেউ।

পাশেই একটা গ্রাম্য ঘাট। সেই ঘাটে সারাদিন পুরুষরা এলেও সন্ধ্যের সময় শুধু নারীরাই জল সইতে আসে।

ঘাট মানে তিনখণ্ড তালগাছের গুঁড়ি ফেলা। তিনজন রমণী সেই ঘাটে দেহ প্রক্ষালন করছে। গ্রামটি মুসলমান-প্রধান। দিনমানে রমণীরা ঘাটে আসে না।

রমণীরা নিজেদের মধ্যে কলস্বরে কথা বলছিল, হঠাৎ যেন তারা কাছেই উঃ শব্দ শুনতে পেল।

সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে তারা উৎকর্ণ হল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা আবার পরিষ্কার শুনতে পেল উঃ। খুব কাছেই, পুরুষের কণ্ঠ।

দু'জন রমণী সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে দৌড় দিল আলুথালুভাবে। একজন দাঁড়িয়ে রইল, তার নাম রাবেয়া খাতুন, তার বিশেষ ভয়ডর নেই। ভয়ের চেয়েও তার কৌতূহল প্রবৃত্তি বেশি।

আরও কয়েকবার অস্ফুট শব্দ শুনে সে পাড়ে উঠে বটগাছটির কাছে গিয়ে দেখতে পেল কলার ভেলাটাকে। তার ওপরে একজন মনুষ্য শয়ান।

রাবেয়া এই গ্রামে ধাইমার কাজ করে। কোনও কোনও গুরুতর রুগ্ন মানুষের সেবার জন্যও ডাক পড়ে তার। সে মৃত ও অর্ধমৃত মানুষ দেখায় অভ্যস্ত। সে বুঝতে পারল, এই দেহটির মধ্যে এখনও প্রাণ ধুকপুক করছে। চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচান যায়।

কিন্তু কলার ভেলা থেকে সে মানুষটাকে তুলবে কী করে? একার পক্ষে তো সম্ভব নয়।

সে তখন উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল, ও খাদিজা, ও ফতিমা, তোরা ফিরে আয় রে, ভূত-জিন কিছু না। একজন জিন্দা মানুষ।

কয়েকবার ডাকেও তারা ফিরল না, সাড়াও দিল না। কিন্তু অন্য তিনজন রমণী এল কিছু না জেনে। রাবেয়ার কথা শুনে তারা ধরাধরি করে মানুষটাকে তুলল। তার আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। সর্বাঙ্গে মারি-গুটির চিহ্ন।

একজন বলল, জিন্দা না মুর্দা? ও রাবেয়া, এরে নিয়ে কী করবি?

রাবেয়া সেই দেহের নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বলল, দ্যাখ, এখনও শ্বাস আছে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এরে আমি ঘরে নিয়ে যাব।

আর একজন বলল, কোন জাতের মানুষ কে জানে।

রাবেয়া বলল, আল্লার জীব তো বটে।

রাবেয়ার পীড়াপিড়িতে অন্য নারীরা ধরাধরি করে মৃতবৎ পুরুষটিকে পৌঁছে দিল রাবেয়ার কুটিরে। বেশি দূর নয়, কাছাকাছি এক তালপুকুরের

পাশে।

রাবেয়ার এক পুত্র ও কন্যা, তার স্বামীও বেঁচে আছে। কিন্তু সে থাকে তার তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে অন্য গ্রামে। মেয়েটির শাদি হয়েছে আজিমগঞ্জে, ছেলে চলে গেছে খুলনা। রাবেয়া নিজেই নিজের পেট চালায়।

পুরুষটি দু'-তিনবার মাত্র যন্ত্রণার শব্দ করেছে। তারপর আর তার নড়াচড়া নেই। চোখও মেলেনি। সে বেঁচে আছে, না এর মধ্যে মৃত্যু ঘটে গেছে তাও বোঝা যায় না। রাবেয়ার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে।

পানি গরম করে, তাতে ন্যাতা ভিজিয়ে মানুষটির সারা গা ভাল করে মুছে দিল সে। পুঁজ-রক্তে তার ঘৃণা নেই। এই মানুষটি কতদিন ধরে জলে ভাসছে, তাই-ই বা কে জানে!

রাবেয়ার নিজস্ব গরু নেই, এককালে ছিল, সেই গোয়ালটি এখন শূন্য পড়ে আছে। সেখানেই সে শয্যা পেতে দিল এই আগন্তুক রোগীর। এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চেয়ে আনলো এক বাটি দুধ। সেই দুধ গরম করে, তার মধ্যে পলতে ডুবিয়ে একটু একটু করে খাওয়াল মানুষটিকে।

তিনদিন ধরে চলল এরকম অক্লান্ত সেবা।

মানুষের সেবা করাও এক প্রকার নেশা। যাদের এই নেশা থাকে, তারা একজন মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচিয়ে তুলে যে-আনন্দ পায়, তার সঙ্গে আর কোনও আনন্দেরই তুলনা চলে না। কেউ কেউ আবার মানুষের ক্ষতি করে, মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে আনন্দ পায়, আর কেউ কেউ আনন্দ পায় নিঃস্বার্থ সেবায় কারুর জীবন ফিরিয়ে দিয়ে। দুনিয়াটা এই ভাবেই চলছে।

প্রথম চক্ষু মেলে লালু অস্ফুট স্বরে বলল, মা।

সেই স্বর শুনে খুশির আবেগে কেঁপে উঠলো রাবেয়া। তার পরিশ্রম সার্থক। কোনওক্রমে আবেগ দমন করে সে বলল, আমি তোমার মা নই বাছা। তুমি আর একটু সেরে ওঠো, তারপর মায়ের কাছে যাবে।

ঘরে একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। তার অস্পষ্ট আলোয় লালু দেখল, তার সামনে ঝুঁকে আছে এক রমণীর মুখ। মানুষ চেনার ক্ষমতা নেই। লালু আবার বলল, মা!

রাবেয়া লালুর প্রায় মায়েরই বয়সী। আনন্দে তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। সে বলল, পানি খাবে? তেষ্টা লেগেছে?

পরদিন সকালে লালু আস্তে আস্তে উঠে বসল। তার শরীরে এখনও অসহ্য ব্যথা, একটা চক্ষু খুলতে পারছে না, কিন্তু জীবনের স্পন্দন ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে ক্ষুধা বোধ।

রাবেয়া জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী বাছা?

লালু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নাম? তার মনেই পড়ল না সে কে।

রাবেয়া আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ি কোথায়? গ্রামের নাম কী?

লালু দু'দিকে মাথা নাড়ল। তার কিছুই মনে নেই। তার অতীত ঝাপসা হয়ে গেছে।

একটু পরে সে বলল, আমার ক্ষুধা লাগে।

রাবেয়া বলল, আমি তো ভাত ফুটাচ্ছি। তোমার জাত-ধর্ম তো কিছু জানি না। এই কয়দিন ভাত খাইতে দিই নাই। আমার হাতের ভাত কি তুমি খেতে পারবে?

জাত বা ধর্ম কথাগুলির কোনও মর্মও বুঝল না লালু। সে আবার কাতর ভাবে বলল, আমার ক্ষুধা পাইছে।

রাবেয়া বলল, আহা রে! দুবলা মানুষ, ক্ষুধার সময় খাইতে না দিলে গুনাহ্ হয় না?

একটা কলাইকরা শানকিতে সে খানিকটা ফেনা ভাত, বেগুন সেদ্ধ আর লবণ দিয়ে মেখে খেতে দিল লালুকে। লালু পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই অন্ন খেয়ে আবার একটা লম্বা ঘুম দিল।

আরও দিন তিনেক পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল লালু, উঠে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু শরীর বেশ দুর্বল। রাবেয়া তার সারা শরীরে হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিল। গুটিগুলো খসে গেলেও গায়ে মুখে তার কালো কালো দাগ, বাঁ চোখটা খোলে না। হেঁটে বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই, পূর্ব পরিচয় তলিয়ে গেছে বিস্মৃতিতে, সে যাবেই বা কোথায়?

রাবেয়াও তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে মোটেই অরাজি নয়। আছে থাকুক না।

রাবেয়া স্বামী পরিত্যক্তা হলেও স্বাবলম্বী, সংসারে আর কেউ নেই, লালুর ভাগ্য ভাল যে, এরকম একজন দয়াবতী রমণীর নজরে পড়েছিল বলেই উদ্ধার পেয়েছে। পুরোপুরি সংসারী কোনও পরিবারের কেউই এমন একজন ছোঁয়াচে অসুখের মুমূর্ষু রুগিকে বাড়িতে আশ্রয় দিত না।

গ্রামের অনেকেই রাবেয়ার বাড়িতে এরকম একজন অতিথির কথা জেনে গেছে। তারা কেউ কেউ লালুকে দেখতে আসে। কিন্তু কথাবার্তা জমে না। লালু তো কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে না। শুধু মুখখানা হাসি-হাসি করে রাখে।

রাবেয়ার স্বামীর এক ফুফাতো ভাইও আসেন মাঝে মাঝে। তিনি একজন ফকির। তিনি গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ান, কোনও এক জায়গায় স্থির বসতি নেই। এই অঞ্চলে এলে রাবেয়ার বাড়িতে দু'-একদিন বিশ্রাম নিয়ে যান। তিনি এলে তার কাছ থেকে এই গ্রামের বাইরে যে-পৃথিবী, তার খবর পাওয়া যায় কিছু কিছু।

সবাই তাঁকে ফকির সাহেব বলে ডাকে। তিনি অবশ্য সহাস্যে বলেন, ফকির না ছাই! আমার কি জানবুঝ কিছু আছে? পড়া-লিখা জানি না। কোরান-হাদিস পাঠ করি নাই, আল্লাহ'র কুদরতই বা কতটুকু বুঝি? ভ্যাক ধরছি, দাড়ি লম্বা করছি, মাইনষে ভয়-ভক্তি করে। বাড়িতে গ্যালে খাইতে দেয়। বেশিদিন থাকি না তো ওই জন্যই, যদি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ধরা পইড়্যা যায়।

এর মধ্যে ফকির এলেন একদিন রাবেয়ার বাড়িতে। রাবেয়া তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে আসন পেতে বসতে দিল দাওয়ায়। এই ফকিরের প্রতি তার খুব শ্রদ্ধা।

ফকির গ্রামে ঢুকলেই কিছু কিছু মানুষ তার পিছু নেয়। তারাও এসে বসে রাবেয়ার বাড়ির উঠোনে। ফকির তাদের খবরাখবর দেন। ফকিরের কাছ থেকেই গ্রামের মানুষ জেনেছে যে, টুপিওয়ালা সাদা চামড়ার মানুষগুলোই এখন রাজার জাত। মোগল-পাঠানদের আমল শেষ। এর মধ্যে দেশি সেপাইরা হঠাৎ একবার ক্ষেপে গিয়ে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিয়েছিল মালিক সাহেবদের দিকে। হিন্দু-মুসলমান সব এককাট্টা, তবে শেষ পর্যন্ত পারেনি, সাহেবদের কামানের মুখে বিদ্রোহীরা সব ছাতু হয়ে গেছে।

কামান কী? কামান কেমন দেখতে?

ফকির একটা তালগাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই তালগাছের লাহান। লোহার, কিন্তু ভিতরে ফুটা। মইধ্যে থিকা ভলকে ভলকে আগুনের গোলা বাইরায়। শব্দে কান ফাটে।

এই বর্ণনা শুনে যার যা বোঝার বুঝে নেয়।

ফকির এমনিতে উপদেশ দেন না, তবে গান শোনান। তাঁর গানের গলা বেশ ভাল।

লালুকে দেখে, তার সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি একটুক্ষণ মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো, এই একজন খাঁটি মনুষ্য। এর নাম নাই, ঠিকানা নাই, জাতি, ধর্ম, কিছুই নাই। তাই এর কোনও হাঙ্গামাও নাই। খোদা যখন মানুষের সৃষ্টি করছিলেন, তখন হবা আর হাওয়ার কি কোনও জাইত-ধরম ছিল? কী সরল, সুন্দর জীবন ছিল তাদের, খোদা তো তাগো কোনও ধর্মে দীক্ষা দ্যান নাই।

একজন কেউ প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ফকির হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রও, রও, তর্কে কাম নাই। আমার কথা মানতে না চাও মাইন্যো না। শোনো, একখান গান শোনো।

সন্ধ্যের পর আর সবাই চলে গেলে ফকির, রাবেয়া আর লালু একত্রে খেতে বসে।

রাবেয়া ফকিরকে জিজ্ঞেস করল, সাঁই, আপনে বলেন তো, এই মানুষটার আগামীতে কী হবে? কিছুই বোঝে না, কোনও কর্মই জানে না, আমার ওপর নির্ভর করে আছে। আমার এখানে যতদিন থাকে থাক, আমার আপত্তি নাই, আল্লার ইচ্ছায় খাওয়া জুটে যাবে, কিন্তু পুরুষ মানুষ, একটা কিছু তো করা লাগে! সারা জীবন তো এমন যাবে না!

ফকির হেসে বললেন, কে বলেছে, কোনও কর্মই জানে না? এই যে ভাতের গেরাস নিজেই মুখে তুলে নিতেছে, সে কি ওরে শিখাতে হয়েছে? সব তো ভুলে যায় নাই, না হলে বস্ত্র পরে কেন? উলঙ্গ তো থাকে না। আগুনে কি হাত দেয়? কথা কইতেও জানে। এসবও কি কম জানা গো?

লালু অবাক হয়ে ফকিরের দিকে চেয়ে থাকে।

রাবেয়া বলল, আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি কিছু অপরাধ করছি না তো? হয়তো কোথাও ওর মা-বাপ আছে, ভাই-বোন আছে, বউ-ছেলে মেয়ে আছে, তারা কান্নাকাটি করে, অথচ ও আটক আছে আমার কাছে। এতে কি আমার গুনাহ্ হয়?

ফকির বললেন, তুমি যা পুণ্য করেছ একে বাঁচিয়ে, তাতে তুমি যদি বেহেস্তে যেতে চাও, সোজা চলে যাবে, কেউ আটকাবে না।

রাবেয়া বলল, যদি কইলেন ক্যান? আপনি বেহেস্তে যেতে চান না?

ফকির বললেন, হিন্দুরা যারে কয় স্বর্গ, মোছলমানরা কয় বেহেস্ত, সে দু'টাই আমার যে মনে হয় কারাগার। একবার গেলে আর বাহির হতে পারব না। থাক, আমার অত সুখে কাম নাই।

রাবেয়াও এবার হাসতে হাসতে বলল, আপনি কী যে বলেন, এমন কখনও শুনি নাই।

ফকির বললেন, এই মানুষটার অতি কঠিন রোগ হয়েছিল। মাথাতেও চোট লেগেছিল কি না কে জানে! এ যখন কিছু কিছু জিনিস মনে রেখেছে, তখন অন্য বিষয়েও চৈতন্য ফিরে আসবে। পায়ে এখনও জোর হয় নাই, মাথায় জোর হবে কী করে? আরও দুই-চার দিন যাক।

এবার লালু জিজ্ঞেস করল, তারপর আমি কী করব? কোথায় যাব?

ফকির বললেন, যেদিকে দু'চোখ যায় ঘুরে বেড়াবে। দুনিয়ায় কি জায়গায় অভাব? পেটের ভাত জুটে গেলেই হল। সকলের আগে খুঁজে বার করতে হবে, তুমি কে? ভাইটি, মনে রেখ, সব খোঁজাখুঁজির মধ্যে বড় হল নিজেকে খোঁজা।

লালু বলল, আমি কে? খুঁজতে হবে।

ফকির বললেন, আর একটা কথা বলি। কখনও মানুষের সঙ্গে তর্ক করতে যেও না। কোনও লাভ নাই। অনেকে যেন কুতর্কের দোকান খুলে বসে। যার যা বিশ্বাস সে তাই লয়ে থাকুক না। পাপ-পুণ্যও তো দেশে দেশে বদল হয়। তিব্বত নিয়মে যা পুণ্য, আমাগো নিয়মে তাই-ই পাপ।

রাবেয়া জিজ্ঞেস করল, তিবত কী?

ফকির বললেন, তিবত না, তিব্বত। ওই নামে এক দেশ আছে। সে দেশে এক নারীর বহু পতি হয়। আর এই দেশে তা হল ব্যাভিচার। সেই নারীরে পিটায়ে মেরে ফেলাবে। অথচ সকলেই তো মানুষ।

রাবেয়া বলল, আমরা তো অনেক মানুষের কথা জানি না। সাঁই, আপনি জানেন।

ফকির বললেন, ইতিউতি যাই, মানুষের মুখে নানান কথা শুনি। আমাগো এখন যে রাজার দেশ, সেই দেশের নাম বিলাত। সেখানকার রাজার যে রাজা, তার নাম কী জান? যিশু। খুব বড় অবতার। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, গরু আর শুয়ার দু'টাই খেতে পার। তারা দিব্যি তাই খায়, লম্বা চওড়া চেহারা, লড়াইও করতে পারে। অথচ দ্যাখো, হিন্দু আর মোছলমান এই গরু আর শুয়ার নিয়ে কত লাঠালাঠি আর নষ্টামি করে।

কথায় কথায় রাত বেড়ে যায়। এক সময় সবাই শুয়ে পড়ে।

দু'দিন পরে ফকিরের বিদায় নেবার পালা এসে গেল। এর মধ্যে লালু বেশ ন্যাওটা হয়ে গেল ফকিরের, তার মুখেও কিছু কিছু কথা ফুটেছে।

ফকির যখন নিজের পুটুলিটা কাঁধে তুলে নিলেন, সে ব্যাকুল ভাবে বলল, ফকিরসাহেব, আমারেও আপনার সাথে নিয়ে চলেন।

ফকির বললেন, আমার সাথে যাবে, আমি তো সারাদিনই হাঁটি। পারবে? আচ্ছা দেখি তো।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওপরের একটা ডাল দেখিয়ে বললেন, এইটা ছোঁও দেখি।

ফকির নিজে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনবার সেই ডালটা স্পর্শ করলেন।

ফকিরের চেয়ে লালুর বয়স অনেক কম, কিন্তু সে ফকিরের মতন লাফাতেই পারল না। তৃতীয়বার বসেই পড়ল।

ফকির মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু, এখনও সব ঠিক হয় নাই। পায়ে জোর আসে নাই। আরও কয়েকদিন লাগবে। তারপর যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাইও।

লালু বলল, ফকিরসাহেব, আপনার সাথে কি আর দেখা হবে না?

ফকির বললেন, কোনওদিন হয়তো পথেই দেখা হয়ে যাবে। আর পরিপূর্ণ বর্ষার সময় ঘোরাঘুরি করা যায় না, তখন আমি কিছুদিন কুমারখালি গ্রামে থাকি। যদি কখনও সেখানে যাও, দেখা হতে পারে। আমি ফকির-টকির কিছু না। একসময় পালকি বইতাম। আমার নাম সিরাজ, তখন লোকে বলত সিরাজ কাহার। এখন বলে সিরাজ সাঁই। ধনী লোকেরা আমারে চেনে না, গরিব মানুষদের আমার নাম করে পুছলে আমার ঘর দেখায়ে দেবে। এসো তুমি।

হাঁটতে হাঁটতে সিরাজ সাঁই মিলিয়ে গেলেন পথের বাঁকে।

আবার লালু একা। রাবেয়াও প্রায়ই দিনেরবেলা বাড়ি থাকে না, লোকের বাড়িতে ডাক পড়ে। লালুর জন্য খাদ্যদ্রব্য রেখে যায়।

একা একা কুটিরের মধ্যে লালুর আর মন টেকে না। সে একটু একটু বাইরে যায়। গুটি গুটি পায়ে নদীর ধারে গিয়ে বটগাছের তলায় বসে।

সারাদিন পুরুষরা এই নদীর ঘাটে স্নান করতে আসে। নদী দিয়ে নৌকো যায় অনেক। কতরকম মানুষ! বর্ষা নেমে গেছে, নদী এখন স্বাস্থ্যবতী, ওপার দেখা যায় না। অনেক নৌকোয় পাল তোলা থাকে। বাতাস যখন পড়ে যায়, তখন পাড় দিয়ে এক-একজন গুণ টেনে নিয়ে যায়।

সন্ধের পর পুরুষদের এখানে থাকতে নেই, তাও লালু জানে। সে তখন ঘরে ফিরে যায়। এখন সে গুনগুন করে গানও গায় আপন মনে। কুঁড়েঘরের ডান দিকে তালগাছে একটা ইস্টিকুটুম পাখি এসে ডাকে। দু'দিক থেকে দুটো ঘুঘু ডাকে, ঠাকুর, গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো! এই ডাক তার চেনা লাগে।

কোনও বাড়ির কাজ থেকে ফিরে রাবেয়া রান্নাবান্না করে। লালু আগে থেকেই আলো ধরিয়ে বাসন মেজে রাখে। ঘরকন্নায়ও সাহায্য করে নানারকম।

রাবেয়া বলে, থাক, থাক, তোমাকে আর ঘর ঝাট দিতে হবে না। আমার নিজের ছেলেও তো আমারে কোনওদিন একটু কুটো নেড়েও সাহায্য করেনি। নিজের সন্তান আমারে ছেড়ে দূরে চলে গেছে, আল্লা আমারে আর একটি সন্তান এনে দিয়েছেন।

একদিন লালু নদীর ধারে বসে আছে দুপুরবেলা। বহতা জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে একটু একটু তন্দ্রা এসে যায়। ভাঙা ভাঙা স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পায় দূরের কোনও দেশ, অচেনা মানুষ। কোনও নৌকো থেকে ভেসে আসে মাল্লাদের গান।

একটা নৌকো এসে ভিড়ল এই ঘাটে। একজন কেউ সেই নৌকো থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল ঝোপঝাড়ের দিকে।

এটা একটা যাত্রাদলের বেশ বড় আকারের নৌকো। দলের অধিকারী স্থূলকায় তাহের দস্তিদার সামনের গলুইতে বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন। বটগাছের গুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আরে, এইডা আমাগো সেই লাউল্লা না?

ছইয়ের ভেতর থেকে গুপি বেরিয়ে এসে বলল, হ, আমাগো লালুই তো। এই লালু! তুই এখানে বইয়া কী করোস?

লাউল্লা, লালু এই শব্দ দুটো শুনে লালুর মাথার মধ্যে ঝনঝন করে উঠল। খুব চেনা! এ তো তারই নাম। আর ওই তো তাহের ভাই, আর গুপি!

স্মৃতির রহস্য বোঝা ভার। কেনই বা তা লোপ পেয়েছিল আর কেনই বা তা অকস্মাৎ ফিরে এল, তা কে বলতে পারে।

লালুর সব মনে পড়ে গেছে।

যাত্রার দলটি অনেকদিন ধরে ভ্রাম্যমান। তারা লালুর বৃত্তান্ত কিছু জানে না। ঘনবর্ষায় যাত্রাপালা বন্ধ, তাই এখন ঘরে ফেরার পালা।

তাহের লালুকে বললেন, গেরামে যাবি নাকি? আমাগো নৌকায় জায়গা আছে, যাইতে পারোস।

গুপি বলল, চল, চল। এহানে তোর কে থাকে?

লালু পড়ে গেল দোটানায়। মনশ্চক্ষে সে দেখতে পাচ্ছে তার মাকে, স্ত্রীকে, বাড়ির সামনে জম্বুরা গাছটিকে, উঁচু মাটির রাস্তা, তার একদিকে

পাট ক্ষেত, অন্য দিকে জলাভূমি, কখনও-সখনও সেই জলাভূমির মধ্যে দেখা যায় আলেয়া, এই সব তাকে টান মারছে। ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে যেতে।

আবার মাতৃসমা রাবেয়াকেই বা ছেড়ে যাবে কী করে। সে তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। এ ঋণ তো কোনওদিনও শোধ করা যাবে না।

যাত্রাদলের আরও কয়েকজন নৌকো থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙতে লাগল। গুপি জিজ্ঞেস করল, তোর বাসা কোথায় রে লালু? তুই বেড়াইতে আইছোস না কাম-কাজ কিছু আছে?

গুপি আর তাহেরকে লালু নিয়ে এল রাবেয়ার কুটিরে। রাবেয়া আজ আর কাজে যায়নি, উঠোনে বসে বড়ি দিচ্ছিল, অতিথিদের বসাল দাওয়ায়।

লালু যখন বলল, এরা আমার গ্রামের মানুষ, রাবেয়া কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লালুর দিকে। এরকম কণ্ঠস্বরে লালুকে কখনও সে কথা বলতে শোনেনি।

সে তাহেরকে বলল, আপনারা অরে চেনেন? খুব ভাল হইল। এতদিন তো কোথায় অর বাড়ি-ঘর, কে আছে সংসারে, এমনকী নিজের নামও কইতে পারে নাই।

তাহের বললেন, কেন, ওর কী হয়েছিল?

রাবেয়া সংক্ষেপে সব জানাল। শুনতে শুনতে লালুর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কান্নার ধারা। সে ধরা গলায় বলল, আম্মা, তোমারে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না!

রাবেয়া বলল, তা কি হয় বাছা! আমি তোমারে কয়দিন মোটে পালছি। কিন্তু তোমার নিজের জননী পুত্রহারা হয়ে কত না কেন্দেছেন। তোমারে ফিরে পেলে তিনি আনন্দ সাগরে ভাসবেন। এরপর তোমারে এহানে ধরে রাখলে আমার পাপ হবে না?

গুপি বলল, অর মা আছে। ঘরে একখান কচি বউও তো আছে। অর বউ গোলাপি আমার বউয়ের মামাতো বইন।

রাবেয়া চোখ বড় করে বলল, হিন্দু? ও তো কিছু বলতে পারে নাই। আমার রান্না ভাত খাইছে।

তাহের বললেন, আপনে অরে জীবন দান করছেন। ভাত না খাইলে বাঁচত কেমনে? ভাত এমন চিজ, খোদার সঙ্গে উনিশ-বিশ।

এরপর রাবেয়া চক্ষের পানিতে বিদায় দিল লালুকে। সেও ফোঁপাতে ফোঁপাতে গিয়ে নৌকোয় উঠল।

ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল রাবেয়া। নৌকো স্রোতে ভাসল, ক্রমশ রাবেয়া অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেল।

তাহের একটু পরে লালুর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, তোর তো জাইত গেছে রে লাউল্লা! মোছলমানের ভাত খাইছস। মায়েরে গিয়া কী ক'বি?

গুপি বলল, মায়ের কাছে আবার সন্তানের জাত আছে নাকি? নে লালু, একটা গান গা, তাইলে কষ্ট কমবে।

বেশি অনুরোধ করতে হল না, লালু স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা গান গেয়ে উঠল:

এ দেশেতে এই সুখ হল আবার কোথা যাই না জানি
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি।
কার বা আমি কেবা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিন মনি।...

তাহের জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার গান রে, কে রচেছে?

লালু উদাসীনভাবে বলল, জানি না।

৫

দাসপাড়ায় হইচই পড়ে গেল। একজন মরা মানুষ ফিরে এসেছে।

দলে দলে লোক দেখতে এল তাকে। শিশুরা মায়ের পেছনে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারছে, যেন তারা ভূত দেখছে।

দাওয়ায় বসে আছে লালু। একটা লুঙ্গি পরা, খালি গা। সারা গায়ে আর মুখেও কালো কালো বসন্তের দাগ, একটা চক্ষু বোজা। তার চেহারা বদলে গেছে অনেক।

দু'-চারজন ফিসফিস করে কানাকানি করতে লাগল। এ পদ্মাবতীর ছেলে লালু নয়। এ অন্য মানুষ।

নিতান্ত উড়ো খবর তো নয়, বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্বয়ং কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন এসে বলেছেন যে, তাঁরা লালুকে মরতে দেখেছেন। কবিরাজমশাই ধন্বন্তরীর মতন, তিনি কারুর মৃত্যু ঘোষণা করলে তার পক্ষে কি আর বেঁচে থাকা সম্ভব? তাছাড়া তার মুখাগ্নি করা হয়েছিল। সেই মানুষ বেঁচে ফিরে আসছে। এ একটা গাঁজাখুরি কথা নয়! ও নাকি এখন মুসলমান? বাড়ি থেকে বেরুল হিন্দুর ছেলে, ফিরে এল মুসলমান হয়ে, ছি ছি, এমন কথা শোনাও পাপ! একে কোনওক্রমেই আর লালু বলে মানা যাবে না।

পদ্মাবতী প্রথমে গুপি, তাহেরের সঙ্গে লালুকে উঠোনে পা দিতে দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন, কে? কে? এ কি আমার লালু? অ্যাঁ? লালু?

এত বেশি আবেগ যে, তিনি পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে। তখন তাঁর মাথায় জল দিতে হয়। তিনি আবার চোখ মেলার পর লালু বলেছিল, হ মা, আমি।

তারপর আত্মস্থ হয়ে পদ্মাবতী তাহেরদের কাছ থেকে সব শুনলেন। তখন আবার অন্যরকম আবেগ শুরু হল। তিনি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, হা আমার পোড়া কপাল। আমি ভাবলাম, ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন। কিন্তু এ কী হল? ছেলে মোছলমানের ঘরে ভাত খেয়েছে। মোছলমান মেয়েমানুষকে মা বলে ডেকেছে। এখন আমি এ ছেলেকে ঘরে নিই কী করে? এর থেকে যে আমার মরণও ভাল ছিল। আমি আগেই মরলাম না কেন?

গোলাপি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। তার চক্ষু থেকেও অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে, হয়তো তা আনন্দের অশ্রু, কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতামত। কয়েকজন বলল, মন্ত্র উচ্চারণ করে যে-মানুষের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেছে, তাকে আবার জীবিত বলে গণ্য করা যায় কীভাবে? কয়েকজন বলল, ও যখন মোছলমান হয়েছে, তখন তো আর হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওর মা যদিও বা ওকে রাখে, তাহলে ওকে একঘরে করা হবে। ওরা কোনও কাজ পাবে না। খাবে কী করে?

লালুর সঙ্গে কেউ কথা বলছে না, পদ্মাবতীকে আড়ালে ডেকে নানাজনে নানা পরামর্শ দিচ্ছে।

কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের কাছেও খবর পৌঁছল। প্রথমে তিনি একবার ভাবলেন, স্বয়ং এই আগন্তুককে দেখতে আসবেন। তারপর মত বদল করলেন। দেখার কী আছে, তিনি তো ভালভাবেই জানেন, লালু বেঁচে নেই। একটুও প্রাণের চিহ্ন থাকলে কি তিনি তাকে বাঁচাবার সবরকম চেষ্টা করতেন না? মুখাগ্নি করতে তো তিনিই বলেছিলেন। অন্য কেউ এসেছে কুমতলবে, তিনি তার মুখ দর্শনও করতে চান না।

সব লোকেই সন্ধের পর বিদেয় নেয়। অন্ধকার নেমে এলে গ্রামের মানুষ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে থাকে না। এই সময় সাপখোপের বড় ভয়।

ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল।

লালুর থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন পদ্মাবতী। গোলাপি এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে দরজার ধারে। কোনও কথা নেই। এরপর কী হবে?

খানিক বাদে, পদ্মাবতীর খেয়াল হল যে, লালু কতক্ষণ আগে এসেছে, তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। এবেলার ডাল-ভাত ওবেলাই রান্না করা থাকে।

রান্নাঘরের পেছনে গোটাকতক কলাগাছ। একটা কলাপাতা কেটে আনলেন পদ্মাবতী। লালুর সামনে কলাপাতাটা পেতে দিয়ে একটু দূর থেকে ভাত বেড়ে দিলেন।

ক্ষুধার্ত লালু হাত বাড়াতেই পদ্মাবতী বললেন, দেখিস বাবা, আমারে

ছুঁয়ে দিস না যেন।

লালুর নিজস্ব একটা কাঁসার থালা আছে। বরাবর সে তাতেই খায়। কলাপাতা দেখে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার থালাটা বিক্রি করে দিয়েছ নাকি?

পদ্মাবতী বললেন, না, দিই নাই। এখন তো বাড়ির থালা-বাসনে খেতে নাই। কলাপাতাও তো ভাল। বউমা, একটা কুপি জ্বাল্।

লালু বলল, বৃষ্টির ছাঁট আসতেছে। ঘরের মইধ্যে যেতে হবে।

পদ্মাবতী বললেন, নারে, ঘরেও তো যাওয়া যাবে না। ঘরে যে রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-জনার্দন আছেন।

লালু বলল, ঠাকুরের ছবি আর সরা? সেগুলান বাইরে এনে রাখা যায় না?

পদ্মাবতী বললেন, ছিঃ বাবা, ও কথা বলতে নাই। ঠাকুর-দেবতাদের কি সরাতে আছে?

লালু জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে আমি শোব কোথায়?

পদ্মাবতী করুণ কণ্ঠে বললেন, তোকে একটু কষ্ট করে বাইরেই শুতে হবে। তুই মুসলমান হইছিস। হিন্দুর ঠাকুর-দেবতার সামনে তোর তো আর যাইতে নাই।

লালু একটু গলা তুলে অসহিষ্ণুভাবে বলল, তোমরা তখন থেকে বলতেছ, আমি মোছলমান হইছি। মোছলমান হইছি, কই, আমি তো কল্‌মা পড়ে মোছলমান হই নাই! আমি তো যেমন ছিলাম, তেমনই আছি!

পদ্মাবতী বললেন, তুই যে যবনের হাতের অন্ন খেয়েছিস, তাতেই হিন্দুদের জাত চলে যায়।

লালু জিজ্ঞেস করল, কীভাবে জাত গেল? শরীল থিকা কি ফুস কইরা বাইরাইয়া যায়? জানতে পারলে ধরে রাখতাম। কিছু ট্যারও পাইলাম না!

পদ্মাবতী বললেন, ছিঃ বাবা, এ সব নিয়া তর্ক করতে নাই। আমরা আর কতটুকু জানি। সমাজের মাথারা যা বলেন, আমরা তাই শুনি।

লালুর চকিতে মনে পড়ল সিরাজ সাঁই-এর কথা। তিনি বলেছিলেন, তর্ক করতে নাই। তর্কে কোনও লাভ হয় না।

সে আবার শান্তভাবে বলল, আমার জাত গেছে। আমি আর ঘরের মইধ্যে ঢোকতে পারব না। ঝড়-বাদল যাই হোক, আমার এই দাওয়ায় থাকতে হবে?

পদ্মাবতী বললেন, দেখি কী করা যায়। কয়েকটা দিন একটু কষ্ট কর। একজন বুঝদার লোক কইল, তুই যদি প্রাচিত্তির করোস, পুরুত ডাইক্যা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা যায় আর গ্রামের মানুষদের একবেলা ভোজন করানো যায়, তাইলে সব শোধন হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে যে অনেক খরচ। আমার তো টাকাপয়সা কিছু নাই, দেখি যদি কেউ হাওলাত দেয়।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরে নয়, খুব সহজভাবে লালু বলল, আমি শুধু প্রায়শ্চিত্ত করলে হবে না, পুরুতকে টাকা দিতে হবে। গ্রামের মানুষদের খাওয়াতে হবে। অনেক টাকা খরচ করলে তবে আমি জাত ফিরে পাব!

অন্নস্পর্শ করেনি সে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অমন জাতে আমার দরকার নাই মা। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

পদ্মাবতী ব্যাকুল হয়ে বললেন, সে কী! কোথায় যাবি! কোথায় যাবি!

লালু বলল, বুঝে গেছি! এ বাড়িতে আমার ঠাঁই নাই। তোমারে আর

দেহ একটা নয়, দুটো। একসঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গোঙানি আসছে ওই নারীর কণ্ঠ থেকেই।

আমি বিপদে ফেলতে চাই না।

পদ্মাবতী বললেন, ওরে লালু, আমি তো জানি, তুই আমার বুকের ধন। তুই আমাব একমাত্র সন্তান। তোকে ফিরে পেয়েও আবার ছেড়ে দিলে আমি বাঁচব কেমন করে?

লালু বলল, যার জাত চলে যায় সে আর তোমার সন্তান থাকে না। আমি তো প্রায় মরেই গেছিলাম, ধরে নাও আমি বাঁইচ্যা উঠি নাই। যেখানে জাত-পাতের ঠেলাঠেলি নাই, আমি তেমন জায়গায় চলে যাব।

পদ্মাবতী হাহাকার করে বললেন, তেমন জায়গা কি কোথাও আছে? সবখানেই তো দেখি হিন্দু, না মোছলমান না কেরেস্তান নিজের নিজের ধর্ম নিয়ে থাকে। একসময় দেখি সকলের মইধ্যেই গলাগলি ভাব, আবার এক একসময় হাতাহাতি, হাঙ্গামা, কাজিয়া।

লালু বলল, আছে। বন-জঙ্গলের পশুপাখিরা জাত-ধর্ম কিছু মানে না। জাত নাই, তাই জাতও হারায় না। আমি তাদের সাথে গিয়ে থাকব।

এবার সে গোলাপির দিকে ফিরে বলল, তুমি যাবা আমার সাথে?

গোলাপি বলল, আমি কোথায় যাব! আমি কোথায় যাব?

লালু বলল, আমি যেখানে যাব, তুমি আমার সাথে থাকবে।

গোলাপি বলল, মার ভয় করে, আমার ভয় করে।

লালু ঠিক তিনবার ওই একই প্রশ্ন করল তার স্ত্রীকে। তারপর বলল, তয় তুমিও থাকো আমার মায়ের কাছে।

দাওয়া থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল লালু।

পদ্মাবতী পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে লাগলেন, লালু, দাঁড়া, দাঁড়া। শোন আমার কথা।

লালুও তখন দৌড়তে শুরু করেছে। আজ আকাশে জ্যোৎস্না নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল লালু।

৬

এদিকের গ্রামগুলিতে জনবসতি বেশি নয়। মাঝে মাঝেই বিস্তীর্ণ বিল, হাওর, দহ নামে জলাভূমি। এবং পতিত জমি, ঝোপ-জঙ্গল। কোথাও কোথাও অরণ্য বেশ গভীর। সুদূর অতীতে এই সব অঞ্চলই সম্ভবত সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানের ভয়াল সুন্দরবন অংশে মানুষ সহজে যেতে চায় না। সেখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির আর গাছের ডগাতেও দোল খায় বিষধর সাপ।

সেই সব হিংস্র প্রাণীরা মাঝে মাঝে অনেক দূরেও চলে আসে। হঠাৎ কোনও গৃহস্থের গোয়ালঘরে একটা বাঘকে বসে থাকতে দেখা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রতি বছরই বাঘের গ্রাসে আর সাপের বিষে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হয়। নদী থেকেও কুমির ডাঙায় উঠে এসে গরু-ছাগল টেনে নিয়ে যায়। মানুষের শিশুরাও তাদের নজরে পড়লে নিস্তার পায় না। আর শিয়ালের উৎপাত তো আছেই। অতি ধুরন্ধর শিয়ালের মুখ থেকে হাঁস-মুরগি রক্ষা করাই মুশকিল।

আর একরকম প্রাণীও আছে, এ অঞ্চলে তাদের নাম বাঘডাসা, বন-বিড়ালের চেয়ে আকারে বড়, বাঘের চেয়ে কিছুটা ছোট। মৃ-উ-ল, মৃ-উ-ল শব্দে ডাকে। এরাও হিংস্র কম নয়, নিকটবর্তী জঙ্গলে এদের সংখ্যাই বেশি।

ছেঁউড়িয়া গ্রামের অদূরে যে-জঙ্গল, গৃহত্যাগী লালু ক্ষোভে-অভিমানে সেই জঙ্গলেরই অনেকটা গভীরে ঢুকে বসে রইল একটা গাছতলায়। বন্য জন্তুদের জাত-ধর্ম নেই। কিন্তু তারা যে মানুষকে অনেক বেশি হিংস্র প্রাণী মনে করে এবং সুযোগ পেলে মানুষকে আক্রমণও করে, তা লালুর মনে রইল না।

পেটে খিদের আগুন, মাথার মধ্যে উত্তাপ, তাই ঘুম আসে না। রাত বাড়ে, বনের মধ্যে শুকনো পাতায় কিছু কিছু জন্তুর চলাচলের আওয়াজ পাওয়া যায়, হঠাৎ কোনও রাতপাখি ডেকে ওঠে। আকাশ এখন অনেকটা মেঘমুক্ত।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় লালুর বুক ঠেলে কান্না আসে।

কঠিন রোগের যন্ত্রণার সময়ও লালু কাঁদেনি, কোনও মানুষের সামনেই সে কাঁদে না। এখন কেউ নেই, সে বুক উজাড় করে, হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদতে লাগল। সে যেন অনুভব করল, তার অনেক বন্ধন ছিঁড়ে যাচ্ছে, অনেক কিছুর সঙ্গেই তার চিরকালের বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে।

রাত্রিবেলা জঙ্গলে কোনও একলা মানুষ যখন বসে বসে কাঁদে, তখন তার মধ্যে যে-তীব্র নিঃসঙ্গতার ধ্বনি বেজে ওঠে, তা শ্রবণ করার অভিজ্ঞতা আর কোনও মানুষের থাকে না।

ভোরের দিকে লালু ঘুমিয়ে পড়ল।

তার গায়ে খসে পড়ছে গাছের পাতা। সদ্য জেগে ওঠা পাখিরা অবাক চোখে দেখতে লাগল তাকে। কয়েকটা শেয়াল তার দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। কাছাকাছি দৌড়দৌড়ি করতে লাগল কয়েকটা খরগোশ।

বেলা বাড়ে, রৌদ্র প্রখর হয়। গাছতলার ভিজে মাটিতে শুয়ে আছে একজন মানুষ।

কুমিরের বাচ্চার মতন একটা গোসাপ কাছাকাছি এসে চিড়িক চিড়িক করে জিভ বার করছে। ও ডিম পেড়েছে ওই গাছতলায়, মানুষ দেখে ভয় পেয়ে কাছে এগোতে পারছে না।

লালুর ঘুম ভাঙল খিদের জ্বালায়। কাছাকাছি একটা ডোবায় হাত-মুখ ধুয়ে সে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল। কিন্তু খাবে কী?

আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা নাকি বনের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। কিন্তু সেরকম ফল তো এখনকার জঙ্গলে ফলে না। এখন বর্ষাকাল, এখন ঠিক ফলের সময়ও নয়। কিছু কিছু তালগাছ আছে, তাতে ছোট ছোট ফল ধরেছে বটে, কিন্তু ও ফল খাওয়া যাবে না। তাল পাকে ভাদ্রমাসে। অন্যান্য গাছের অচেনা ফল হয়তো কাক-শালিকে ঠোকরায়, মানুষের আস্বাদের উপযুক্ত নয়।

এক জায়গায় রয়েছে অনেক কচু গাছ। কচুর শাকও তো মানুষ খায়। কিন্তু রান্না করতে হয়। লালু জানে, কচুর শাক দু'রকম হয়, সবুজ আর লোহা লোহা রঙের। সবুজগুলোতে গলা চুলকায়, যতই রান্না করা হোক, তবু চুলকানি শোধরায় না। অন্য কচুর শাকের স্বাদ ভাল, ইল্‌শা মাছের মুড়া দিয়ে রাঁধলে তো কথাই নাই!

এইগুলো সবই সবুজ।

মাটির ওপর উঁচু উঁচু হয়ে আছে একপ্রকার কচু, অনেকটা গাঠির মতন, কিন্তু গাঠির চেয়েও বড় বড়। এগুলির নাম আনমেল কচু। লালু দেখেছে, বাড়িতে কখনও চাল বাড়ন্ত হলে তার মা এই আনমেল সেদ্ধ করে খাইয়েছে। কিন্তু কাঁচা খাওয়া কি সম্ভব? চেষ্টা করে দেখতে হবে, যদি গলা চুলকায়, তাহলে একটা তেঁতুলগাছ খুঁজতে হবে, সব জঙ্গলেই তেঁতুল গাছ থাকে। টক খেলে গলা চুলকানির শান্তি হয়।

কচুবন থেকে বেরিয়ে এল একটা সাপ। লালুকে দেখে ফণা তুলল। অল্প বয়েস থেকেই লালু অনেক সাপ দেখেছে, তাই একেবারে আঁতকে উঠল না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একেবারে নড়াচড়া না করলে সাপ কামড়ায় না, এমনকি পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেলেও কামড়ায় না। লালু তা জানে।

সাপটা আর একটা ঝোপে ঢুকে যাবার পর লালু নিশ্বাস ছাড়ল। তখনই সে বুঝল যে, মারুক বা না-মারুক, অন্য জন্তু-জানোয়ারদের ঠেকাতে তার হাতে একটা কিছু থাকা দরকার। এদিক ওদিক খুঁজে সে একটা গাছের শুকনো ডাল ভেঙে নিল। তারপর তার প্রশাখাগুলো ছেঁটে ফেলার পর সেটা বেশ একটা লাঠির আকার নিল। এবং হাতে একটা লাঠি থাকলেই কী করে যেন আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

যতই ক্ষুধা বাড়ুক, লালু আগে কচুর শাকে মুখ দিল না। খানিক খুঁজে সে একটা তেঁতুলগাছ পেয়েও গেল, গাছটি বিশাল, অনেক উঁচুতে তেঁতুল ফলে আছে, হাত যাবে না। লুঙ্গিটা গুটিয়ে নিয়ে সে গাছে উঠতে লাগল, তেঁতুলের কচি কচি পাতাও বেশ খাওয়া যায়।

বাঁদররা যেমন গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, সেইভাবেই একটা উঁচু ডালে বসে তেঁতুলপাতা খেতে লাগল অনেকগুলো। কিছু তেঁতুলও ঝুলছে। সেগুলো একেবারেই কাঁচা, এতই চুকা যে, দাঁত অবশ হয়ে যায়। কিছুটা লবণ জোগাড় করতে পারলে তবু খাওয়া যায়।

গাছ থেকে নেমে আসার একটু পরেই সে হড় হড় করে বমি করতে লাগল। এতখানি কাঁচা টক পাতা কি হজম করা সহজ? বাঁদররা যা পারে,

মানুষ কি তা সব পারে?

মুখ-টুখ ধুয়ে আবার কিছুক্ষণ মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল লালু। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ। যখনই সে আকাশের দিকে তাকায়, গভীর বিস্ময়ে মন ভরে যায়। এ আকাশ কত বড়? কী আছে ওখানে? সত্যিই ওখানে স্বর্গ কিংবা বেহেস্ত আছে? কেউ কি তা দেখে ফিরে এসে বলেছে? ঠাকুর-দেবতারা ওখানে শহর-বাজার সাজিয়ে বসবাস করছেন? আল্লা থাকেন কোন্‌দিকে? তাঁর উরস কোথায় পাতা? আবার খ্রিস্টানদেরও স্বর্গ আছে। কুমারখালিতে এক পাদ্রি ধর্মপ্রচার করছিল, তখন শুনেছিল লালু। তিনি বলছিলেন, ঈশ্বরের পুত্র যিশু। তাইলে যিশুর বাবাই আসল ভগবান? তার নাম তো কেউ বলে না!

লালু ঠিক করল, যতই খিদে থাক, সে আর অখাদ্য-কুখাদ্য খাবে না। দেখা যাক না কতদিন না খেয়ে থাকা যায়। অসহ্য হলে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে গেলেই হবে। এখানে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না, এটাই বেশি ভাল লাগছে।

লালু আবার গাছতলায় এসে বসল। গোসাপটা ছুটে পালাল সঙ্গে সঙ্গে। লালু এবার ওর অসুবিধেটা বুঝতে পারল। গোসাপকে দেখলে একটু একটু ভয় লাগে বটে, কিন্তু ওরা কখনও কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষকে আক্রমণ করার সাহস পায় না।

লালু বলল, ঠিক আছে, আমি সরে যাচ্ছি।

সে এবার একটা শিমুলগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল, আর নড়ল চড়ল না।

এটা কিন্তু ধ্যানে বসা নয়। সে ধ্যানের কী জানে? লেখাপড়া শেখেনি, শাস্ত্রমন্ত্র জানে না, তার কোনও মুক্তি বাঞ্ছা নেই, জীবনদর্শন সম্পর্কেও কোনও বোধ নেই। সে এখন আর হিন্দু নয়, হিন্দু দেব-দেবীদের সম্পর্কে সে আগেও যেমন কিছু কৌতূহলবোধ করেনি, মুসলমানদের ধর্ম বিষয়েও সে বিশেষ কিছু জানে না। নামাজ পড়ার সময় মুসলমানরা কী চিন্তা করে, তা-ও সে কখনও জিজ্ঞেস করেনি। পরলোক সম্পর্কেও তার কোনও অনুসন্ধিৎসা নেই।

সুতরাং তার চুপ করে বসা থাকাটাকে কোনওক্রমেই ধ্যান বলা চলে না। তবে জাগ্রত অবস্থায় কোনও মানুষই একেবারে চিন্তাবর্জিত হতে পারে না। কিছু না কিছু মনে আসেই।

সে বাল্যকাল থেকে যত মানুষজনদের দেখেছে, তাদের কথা ভাবতে লাগল। কতরকম কথা শুনেছে, তার অনেক কিছুই যেন ভুলে গিয়েছিল। এখন জলের মধ্যে ভুরভুরি কাটার মতন অনেক কথাই ফিরে এল। সেই সব কথার নির্যাস থেকে তৈরি হল তার বিন্দু বিন্দু আত্ম উপলব্ধি।

কোনও পাঠশালা, টোলে সে যায়নি, কেউ তাকে লেখাপড়া শেখাবার কথা চিন্তাই করেনি। সে একটা ছাড়া গরুর মতন আপনমনে ঘুরেছে। যাত্রাদলের মহড়ার সময় বসে থেকেছে এক কোণে, এ অঞ্চলে প্রচুর বাউল, ফকিরের আখড়া, কীর্তনের দলও আছে। সে তাদের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করেছে, তখন যা কানে এসেছে শুনেছে। এখন নানান গানের ছত্র, মুরুব্বিদের মুখের কথা ফিরে আসছে তার কাছে। সেগুলো দানা বাঁধছে।

এইভাবে স্মৃতির রোমন্থনে সে যেন একজন অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

খিদের জ্বালাটা দেড়দিন পর্যন্ত বেশ তীব্র থাকে। তারপর শরীরটা যেন আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায়। আর কোনও খাদ্যের কথা মনে পড়ে না। এরকম সময়ে অনুভূতিও অনেক সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। অনেক আপাত সাধারণ কথায় নতুন অর্থও ঝিলিক মারে। তার জাত গেছে, এই কথাটা সে যতবারই ভাবে ততবারই মনে প্রশ্ন জাগে। জাত আসলে কী? ধর্ম কাকে বলে? মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ? ধর্ম না থাকলে কি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই?

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকে লালু, এক একসময় শিরদাঁড়ায় একরকম শিরশিরে অনুভব হয়। গাছেদের কোনও ভাষা নেই, তবু গাছও কি কোনও বার্তা পাঠাতে পারে? কিছু একটা টের পায় লালু, তার অর্থ বোঝে না। মাঝে মাঝে গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ হয়, এক একবার এক একরকম শব্দ, যেন তারও কোনও মর্ম আছে। শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায়।

ক'দিন কাটল, তিনদিন না পাঁচদিন? লালু হিসেব রাখেনি। আস্তে আস্তে তার শরীর থেকে সব রাগ মুছে গেছে। কারুর প্রতি কোনও অভিমানও নেই। সত্যিই যেন সে একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল নতুন মানুষ হয়ে। তাহলে আর তার মা ও স্ত্রী সম্পর্কে কোনও দায়িত্বই রইল না।

এই ক'দিন লালু খাদ্য খুঁজতেও যায়নি, কোনও জন্তু-জানোয়ারও তাকে বিরক্ত করেনি। আর কোনও মানুষের মুখও দেখেনি সে।

তারপর একদিন জঙ্গলে ছুটোপাটির আওয়াজ শুনতে পেল। একজন মানুষ যেন মার মার শব্দে কারুকে তাড়া করছে। কোনও মানুষকে অন্য মানুষরা মারতে আসছে নাকি?

লালু চক্ষু বুজল। মানুষের মৃত্যু সে দেখতে চায় না।

অন্যরকম একটা শব্দ শুনে সে আবার চোখ খুলল। মানুষ নয়, একটা জন্তু ছুটে আসছে, তার পেছনে লাঠি-সোঁটা নিয়ে চার-পাঁচজন মানুষ।

পেছনের মানুষগুলো লালুকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, ভাইডি, ভাইডি আটকাইন অরে, মারেন।

বাঘডাসাটা লালুর দিকেই ছুটে আসছে। এর আগে সে বেশ মার খেয়েছে বোঝা যায়, সারা গা রক্তাক্ত। গর্জন করতে করতে সে ছুটছে, লালুরই দিকে।

লালু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার হাতে মোটা লাঠি। জোরে একবার মাথায় মারলে জন্তুটা আর উঠতে পারবে না। লালু তুললও লাঠিটা, সে দেখতে পেল জন্তুটার অসম্ভব ভয়ার্ত চোখ, ও দেখতে পেয়েছে মৃত্যু?

লাঠিটা নামিয়ে নিল লালু। সে জন্তুটাকে বলল, যাঃ যাঃ!

জন্তুটা এবার কয়েক লাফে ঢুকে গেল একটা ঝোপের মধ্যে।

লালু কেন করল এরকম? এর আগে সে তো অন্যদের সঙ্গে মিলে দু'তিনটে বাঘডাসা, শেয়াল আর পাগলা কুকুর পিটিয়ে মেরেছে। জন্তুরা এসে জ্বালাতন করলে মানুষ তো তাদের মারবেই।

তবে আজ কেন যে লাঠিটা সরিয়ে নিল, তা সে নিজেই বুঝল না।

এই জঙ্গলটা তো মানুষের নয়, জন্তু-জানোয়ারদেরই। এখানে সে কয়েকদিন রয়েছে, কেউ তাকে বিরক্ত করেনি, তার জন্যই কি এই কৃতজ্ঞতা?

লোকগুলো কাছে আসার পর লম্বা মতন একজন জিজ্ঞেস করল, এই তুই ওইডারে মারলি না ক্যান?

একটু বোকার মতন হেসে লালু বলল, জানি না!

কী কথার কী উত্তর! এরকম কেউ কখনও শোনেনি।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, জানি না কী রে বেওকুফ! বল যে পারলি না! লাঠিখান তো উঠাইছিলি।

লালু আবার বলল, ও খুব ভয় পাইছিল।

এবারে দু'-একজন হেসে উঠল। একজন বলল, শোনো কথা, ভয় পাবে না তো কি ও হাসবে? আর একটু হইলেই আমরা অরে ধইরা ফেলাইতাম।

অন্য একজন বলল, আমাগো গেরামের একটা ছাগল মারছে।

কয়েকদিনের অনশনেই সম্ভবত লালুর চিন্তার প্রবাহ কিছুটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। কথার সূত্রও খুঁজে পাচ্ছে না।

সে আপনমনে বলল, মানুষে কি বাঘডাসা মাইরা খায়?

লম্বা লোকটি বলল, এডা কয় কী? পাগল-ছাগল নাকি? আইলো কোথা থিকা?

একজন জিজ্ঞেস করল, এই, তুই কে?

লালুর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, সিরাজ সাঁইয়ের কথা। সব খোঁজার মধ্যে বড় হল নিজেকে খোঁজা। আমি কে? তা তো এখনও জানা হয়নি।

লালু উত্তর দিল না।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, তোর বাড়ি কোথায়? কোথা থিকা আইছোস?

লালু বলল, বাড়ি নাই।

সবাই এখন লালুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সারা গায়ে ধুলো-কাদা মাখা, চুলেও ধুলো, কয়েকদিনের অরণ্যবাসের পর লালুকে পথের পাগলের মতনই দেখায়।

একজন তাকে একটা খোঁচা মেরে বলল, তুই আইছোস কোথা থিকা?

তোর বাপ মায় কী করে?

লালু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

অন্য একজন বলল, পুরা পাগল। কোনও আশা নাই। চল, চল।

আর একজন বলল, আহারে, কোন্ মায়ের যেন বুক ভাঙছে। জন্ম দিছে, লালন পালন করছে, খাওয়াইছে-পরাইছে, এতখানি বড় তো করছে, তারপর সংসারে কোনও কাজেই লাগল না। এই জঙ্গলে থাকলে কতদিন আর বাঁচবে!

লোকগুলি চলে যাবার পর দু'টি কথা লালুর মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। তুমি কোথা থেকে এসেছ, তুমি কে?

এ প্রশ্নের উত্তর তো দাসপাড়ার লালু নয়। আরও গভীর। মানুষ কোথা থেকে আসে? কী মানুষের প্রকৃত পরিচয়?

প্রহ্লাদ পালায় আর একটি বচনও তার মনে পড়ে গেল। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এক ব্রাহ্মণ বলেছিল, লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দ্বাদশ বর্ষানি পালয়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়ষবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ। এর অর্থও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সন্তানকে জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছর পালন করবে, নইলে সে নিজে থেকে কিছু খেতে শিখবে না, কথা কইতে শিখবে না। অনেক জন্তু-জানোয়ারের শাবক দু'-চারদিন পরেই খেতে শিখে যায়, নিজে নিজেই হাঁটতে বা উড়তে শেখে। গরুর বাছুর তো জন্মের কিছুক্ষণ পরেই লাফাতে শুরু করে। শুধু মানুষের বাচ্চা জন্মের পর একেবারে অসহায়, কান্না ছাড়া আর কিছুই জানে না। অন্তত পাঁচ বছর তাকে লালন না করলে বাঁচান যায় না। তারপর তাকে পালন করতে হয়। তাকে শিক্ষা দিতে হয় অনেক কিছু, শুধু তো খাওয়া নয়, সে ভাষা শেখে, মানুষ চেনে, আগুনে হাত দেওয়া যায় না বোঝে। সাঁতার না শিখে জলে নামা যায় না, বাপ-পিতামহর ধর্ম শেখে। আসল কথা পৃথিবীটাকে চিনতে শেখে। সেটাকেই পালন করা বলে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত অন্তত পালন করতে হয়। তারপর ষোলো বছর বয়সে সে লায়েক হয়ে যায়, তখন পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মতন আচরণ করতে হয়।

পণ্ডিত মশাই আরও বলেছিলেন, বাবা-মায়ে মিলে কত পুত্র-কন্যার জন্ম দেয়। কিন্তু প্রকৃতভাবে লালন-পালন করে কয়জন? ধনীরাও ঠিক মতন মন দেয় না, আর গরিব ঘরের তো কথাই নাই।

কোনওমতে চার-পাঁচ বছর বুকের দুধ দেয়, খাওয়ায়, শিশু কিছুর অভাবে কান্নাকাটি করলে চাপড় মেরে মেরে ঘুম পাড়ায়, তারপর তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়। রাস্তার কাঙালিরা যেমন, গেরস্ত বাড়ির অপোগন্ড ছেলে-ছোকরাগুলোর সাথেই বা তাদের কী তফাৎ! তাদের দ্বারা সমাজের কোনওই উপকার হয় না, বরং অশান্তি লেগেই থাকে।

প্রায় ছ'বছর আগে এই কথাগুলো শুনেছিল লালু। তখন বিশেষ মন দেয়নি। এসব জ্ঞানের কথা শোনার ধৈর্য ছিল না। এখন আশ্চর্যভাবে প্রতিটি শব্দ ফিরে এল তার স্মৃতিতে। আর বারবার মনে হতে লাগল, সে এই পৃথিবীতে জন্মেছে বটে, কিন্তু তার তো লালনপালন কিছু হয়নি। তার জন্মদাতা তার কোনও দায়িত্ব নেয়নি, অতি অল্প বয়সেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তার মুখও লালুর মনে নেই।

তার অসহায় বিধবা মা আর কীভাবে তাকে পালন করবেন? মামার বাড়িতে এসে তার মাকে যে কত রকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, তা কি সে শিশু বয়সেও অনুভব করেনি? দু'বেলা দুটি অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তার মাকে, ছেলের দিকে তিনি মনোযোগও দিতে পারেননি। মামাবাড়ির ছেলেরা পাঠশালায় পড়তে যেত, লালুকে তারা সে ধারেও ঘেঁষতে দেয়নি। লালুর অবশ্য তখন মনে হত, তাকে যেন সুবিধেই দেওয়া হচ্ছে, গুরুমশাইয়ের বেতের সামনে বসে থাকতে হবে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কত মজা! সে তখন ঘুরে বেড়াত বনে-বাদাড়ে, কোথায় না কোথায়, শুধু মাঠে মাঠে চুরি করা ঘোড়ায় চাপলেই তার মনে হত, সে বহুদূরে অচেনা দেশে চলে গেছে!

এখন কোনও মানুষকে বইয়ের পাতা থেকে কিছু পড়তে দেখলে তার যেমন অবাক লাগে, তেমন হিংসেও হয়। অত খুদে খুদে কালো অক্ষরে কী করে মানুষের ভাষা লেখা থাকে? এসব আর লালুর জানা হবে না?

মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে সে। ধর্মও চলে গেছে। সে এখন নতুন মানুষ। যেন আবার জন্ম হয়েছে তার। এখন থেকে তার লালনপালনের ভার নিজেকেই নিতে হবে।

লালুর এক সময় ভয় হয়েছিল, লোকগুলো বুঝি তাকে মারবে। রাস্তায় পাগল দেখলে অনেকেই ঢিল ছোড়ে, কঞ্চি দিয়ে পেটায়। এতে কেন তারা আনন্দ পায় কে জানে।

বাঘডাসটাকে কেনই বা সে লাঠি তুলেও মারল না? আহত পশুটার ভয়ার্ত চোখ দু'টি দেখে কেমন যেন হয়ে গেল মনটা। অথচ এই জন্তুগুলো একটু সুযোগ পেলেই যে গৃহস্থের ক্ষতি করে, তাও তো ঠিক। লালু ওই তাড়া করে আসা মানুষগুলোর প্রশ্নের ঠিক মতন জবাব দিতে পারেনি, তখন কিছুক্ষণের জন্য তার মনটা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

সে রাতটাও কেটে গেল, আবার দিনমণির উদয় হল আকাশে। এখানে অরণ্য বেশ ঘন, তাই দিনের বেলাতেও আলো-আঁধারি হয়ে থাকে। একটু দূরে কিছুই দেখা যায় না। সেখানে শুকনো পাতায় খচর-মচর শব্দ হলেই সচকিত হয়ে উঠতে হয়।

লালু শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে যায়। খিদের জ্বালাটা একেবারেই কমে গেছে। প্রায় মনেই পড়ে না। ভবিষ্যৎ নিয়ে সে কী করবে? একটা মনুষ্যজন্ম পেয়েছে, এটা তো শুধু শুধু নষ্ট করা যায় না। এই জঙ্গলে সে মোটেই কাটাতে চায় না বাকি জীবন। সে মানুষের সঙ্গ চায়। কাল মানুষগুলোকে দেখে প্রথমে উৎফুল্ল বোধ করেছিল।

জঙ্গলের এই একাকীত্বের মধ্যে সে এক-একসময় নারী-সঙ্গ পাওয়ার জন্যও আকুতি বোধ করল। দীর্ঘ অসুস্থতার সময় তার এই বোধ একেবারেই ছিল না। এখন মাঝে মাঝেই সে তার পুরুষাঙ্গের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে।

আরও একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে লালু। যখন তখন তার মনে আসছে দু'-একটা গানের পদ। এ গান কার রচনা সে জানে না, কোথায় শুনেছে তাও মনে পড়ে না।

সে গাইতে লাগলো:

এমন মানব-জনম আর কি হবে
যা কর মন ত্বরায় কর
এই ভবে...

৭

দুপুরের দিকে লালুর মনে হল, খানিক দূরে অন্য কেউ যেন গান গাইছে।

প্রথমে মনে হল মনের ভ্রম। এ রকম হয়। কখনও বাতাসের সরসরানিকে মনে হয় মানুষের ফিসফিসানি। মাটিতে মানুষের পদশব্দেরও ভ্রম হয়।

গানটা ক্রমেই কাছে আসছে। তা হলে মনের ভুল নয়। কেউ যেন গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে এই দিকেই। গানের বাণী বোধগম্য হচ্ছে না এখনও।

লালু বড় গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কে কোন্ উদ্দেশ্যে আসছে কে জানে।

ক্রমে আলো-আঁধারি থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ।

মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা, মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ, মাথায় একটা গামছা জড়ান। এবার তার গান একটু একটু বোঝা যাচ্ছে।

মরলেম ভূতের বেগার খেটে
আমার কিছু সম্বল নাইকো গ্যাঁটে!
নিজে হই সরকারি মুটে মিছে মরি ব্যাগার খেটে
আমি দিন মজুরি নিত্য করি পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে...

লালু ভাবল, এ আবার কেমনতরো গান? কোনও যাত্রাপালায় কিংবা বাউল-ভিখিরির মুখে সে এমন গান শোনেনি।

লোকটির হাতে একটা লম্বা লাঠি, কোমরে দা বা কুড়ুলের মতন একটা কিছু গোঁজা।

তা দেখে একবার গা-টা ছমছম করে উঠল লালুর। কোনও হিংস্র মানুষ? কী উদ্দেশে এসেছে এখানে?

লোকটা গান গাইতে গাইতে একটু একটু নাচছেও বটে। আর চুমো খাচ্ছে লাঠিটার ডগায়।

হিংস্র মানুষরা কি গান গেয়ে নাচে? ওর সঙ্গে আর কেউ আছে কি

না তা দেখার জন্য নিঃসাড়ে অপেক্ষা করতে লাগল লালু। খানিক বাদে বোঝা গেল, আর কেউ আসেনি। এ লোকটির চেহারাও তেমন বড়সড় নয়। লালুর চেয়ে মাথায় বেশ ছোট। লালুকে মারতে এলে সুবিধে করতে পারবে না। লালুর হাতেও লাঠি আছে। আর বিনা কারণে মারবেই বা কেন? লালু কী দোষ করেছে?

লোকটি গান থামিয়ে একবার হেঁকে বলল, আরেঃ গেল কোথায়? এইহানেই তো লুকে দ্যাখছিল তারে।

এবার লালু বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে।

লোকটি বলল, এই যে বাপধন। আছিলা কোথায়? ওরেঃব্বাইশ রে, হাতে দেখি একখান লাঠি। মারবা-টারবা না তো?

লোকটি মাথায় এক হাত দিয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

লালুর হাসি পেয়ে গেল। একটু আগে সে সশস্ত্র লোকটিকে দেখে ভয় পাচ্ছিল, এখন লোকটিই তার হাতে লাঠি দেখে ভয় পাচ্ছে।

লালু বলল, না, না।

লোকটি বলল, কওয়া তো যায় না কিছু। পাগল-ছাগলে কখন কী করে বিশ্বাস নাই। শোনও, তুমিও একখান পাগল, আমিও একখান পাগল। পাগলে পাগলে কাজিয়া করে না।

লালু বলল, আমি কেন পাগল হব? মোটেই না।

লোকটি বলল, গেরামের মানুষ যে কইল, জঙ্গলে একখান পাগল আইস্যা গাছতলায় বইয়া রইছে! তাই দেখতে আইলাম। আমি কিন্তু সত্যিই পাগল। আমার নাম আগে আছিল সুলেমান মির্জা, পরে লোকে নাম দিল কালুয়া মির্জা। এখন সবলোকেই কয় শুধু পাগল।

লালু তবু জোর দিয়ে বলল, তুমি পাগল হইতে পার, আমি মোটেই পাগল না!

কালুয়া মির্জা ফিক করে হেসে বলল, সব পাগলই ভাবে, আমি পাগল না, খুব সেয়ানা। এই ভবের বাজারে কে যে পাগল না, তা বোঝাই শক্ত। তোমার নাম কী?

লালু তৎক্ষণাৎ তার নামটা বদলে ফেলল। সে এখন নতুন মানুষ, তার নতুন নাম দরকার। প্রায় কিছুই না ভেবে সে বলল, লালন।

লোকটি বলল, হিন্দু না মোছলমান?

লালন বলল, সেটা জানা বুঝি খুব দরকার?

লোকটি বলল, তাই তো দেখি সবখানে। নতুন লোক দেখলেই মনে প্রশ্ন জাগে, মোছলমান না হিন্দু? মোছলমান হইলে এক রূপ ব্যবহার, আর হিন্দু হইলে অইন্য রকম।

লালন বলল, চেহারা দেখলেই কি জাতধর্ম বোঝা যায়?

কালুয়া বলল, তা কিছু কিছু বোঝা যায় তো বটে।

লালন বলল, এইটাই তো বুঝি না আমি। হিন্দুরা গলায় মালা দেয়। আর মোছলমানরা দেয় তছবি। ছুন্নত দিলে মোছলমান হয়, আর বামুনের গলায় থাকে পৈতা। কিন্তু বামনিদের গলায় তো কিছু থাকে না আর মোছলমান মাইয়াদেরও ছুন্নত হয় না। তাইলে স্ত্রীলোকের কি জাতধর্ম নাই?

কালুয়া বলল, রাখো ওই সব কথা। মাইয়া মানুষদের নাম শোনলেই বোঝা যায়। তবে, তোমার নাম লালন, তোমার নামটা যেন কেমন কেমন। মোছলমান বলেই মনে লয়। নবাব সেরাজউদ্দুল্লার জবাইয়ের পর এই দ্যাশে মোছলমানের মধ্যে পাগলের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে। জানো তো, দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরও গোল্লায় গেছেন।

লালন বলল, দোস্ত, আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি হিন্দু না মোছলমান তাও বুঝি না।

এবারে কালুয়া একেবারে কাছে এসে বলল, যখন আমারে দোস্ত কইলা, তখন হাতে হাত মিলাও। পাগলের আবার জাত-ধর্ম কী? সব সমান।

হাতের লাঠিটা তার এক হাঁটুর চাপ দিতেই সেটা দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো সে তুলে দিল লালনের হাতে।

এতক্ষণ লালন লক্ষ করেনি, যেটাকে সে লম্বা লাঠি ভাবছিল, সেটা আসলে একটা আখ।

তৎক্ষণাৎ লালনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। মানুষের চোখকেও তা হলে বিশ্বাস করা যায় না! চক্ষু যা দেখে, তা বাস্তব সত্য নাও হতে পারে। যেটাকে মনে হচ্ছিল লাঠির মতন একটা অস্ত্র, সেটা আসলে ঠিক বিপরীত, একটা রসালো খাদ্য। এই রকমই তো মানুষ রজ্জু দেখে সর্প ভ্রম করে।

আখের টুকরোটা হাতে নেওয়া মাত্রই লালনের পেটে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল খিদে। সে আখটা প্রায় না ছুলেই চিবোতে শুরু করল। সুমিষ্ট রস তার কণ্ঠনালি থেকে বয়ে এক পবিত্র ঝরনার মতন নামতে লাগল তার জঠরে।

কালুয়া বলল, শোনো, আমি পাগল বলে গ্রামের লোক আমারে যখন তখন খোঁচাখুঁচি করে। পোলাপানেরা আমার ভাতের পাত্র লাথি মাইরা ফেলাইয়া দেয়। কারুর ক্ষতি করি না, তবু এত জ্বালায়। তাই তোমার কথা শুনে ঠিক করলাম, জঙ্গলে এসে দুই পাগলে এক সাথে থাকব। সেইডাই ভালো না, কি কও?

লালন বলল, তোমার কথা শুইনা তো তোমারে একটুও পাগল মনে হয় না?

কালুয়া বলল, দ্যাখবা, দ্যাখবা, আমি মাঝে মাঝে বদ্ধ পাগল হয়ে যাই। কিছুর হুঁশ থাকে না। আমি তখন বিশ্ব-সংসার ওলটপালট করি। তুমি সেই কালে আমারে সামলাইতে যাইও না, দূরে পলাইয়া থেকো। এক-দু'দিন পর আবার ঠিক হয়ে যাই।

লালন বলল, কিন্তু আমরা জঙ্গলে থাকলে খাব কী? এইটুকখানি আখের রস খেয়েই আমার দারুণ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়েছে! আমি সত্যিই পাগল না। যার ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে, সে কি পাগল হয়?

কালুয়া বলল, হবে না কেন? পাগলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে, কামনা-বাসনা থাকে, পাগলেও গান গায়। খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করুম। তাগদ থাকলেই খাদ্য জুটে যায়।

কোমর থেকে একটা কুড়ুল বার করে সে জিজ্ঞেস করল, তুমি বাঁশ কাটিতে জান?

লালন বলল, বাঁশ? না, কাটি নাই কখনও।

কালুয়া বলল, ঠ্যালায় পড়লে শিখতে আর কতক্ষণ লাগে? এই জঙ্গলে অনেক বাঁশঝাড় আছে। গেরামের হাটে বাঁশ ভাল দামে বিকোয়। মাঝে মাঝে বাঁশ বেচে চাউল-ডাইল খরিদ করে আনব। তার আগে নিজেদের জন্য একটা ঘর বান্ধা দরকার। বৃষ্টির সময় মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই চাই না! পাগল হবার আগে আমি ছিলাম ঘরামি। খুব ভাল ঘর বান্ধতে জানি। তোমারে শিখায়ে দেব।

মাঝে মাঝে গেরামে গেলে ঘরামির কাজের অভাব হয় না। মানুষের যেমন অনবরত ঘর ভাঙে, তেমনই নতুন ঘর বানাবার মোহ থাকে।

লালন বলল, তুমি তো বেশ কথা কও!

কালুয়া একগাল হেসে বলল, যতক্ষণ নিজের নাম মনে থাকে, ততক্ষণই। আর যখন ক্ষেপি, মাথায় ভূত চাপে, তখন বৃক্ষেরে ভাবি তৃণ, আর ঘাসের ডগায় এক বিন্দু পানি দেখলেও মনে হয় আসমানের তারা। মা কালীরে মনে হয় খোদা, আর খোদারে মনে হয় মা কালী। আরে ছি ছি ছি ছি, এইসব কথা শোনলে লোকে আমারে মারবে না? বেশ করবে মারবে!

লালন শঙ্কিতভাবে বলল, তুমি মোছলমান হয়েও কালী ভক্ত?

কালুয়া বলল, সেই পাপেই তো আমার মৃত্যু হবে। ভাল করেই জানি। তুমি কালী ঠাকুরের মূর্তি দেখছ ভাল করে?

লালন বলল, ভাল করে, কাছ থেকে কখনও দেখি নাই। আমি যে-গেরামে আছিলাম, সেখানকার বেশির ভাগ মানুষই বৈষ্ণব। গৌর-নিতাইয়ের ভজনা করে। কালীপূজা হয় না।

কালুয়া বলল, ভাল করে দেখলে বুঝতে, ঐ মূর্তির মধ্যে কেমন যেন একটা টান আছে, মনটারে খাঁচার পক্ষীর মতন দোলায়, আমি চক্ষু ফিরাতে পারি না। সে জন্য বাড়িতেও অনেক মাইর খাইছি। শুনছি কি জান, ত্রিপুরা নামে একটা রাজ্য আছে, সেখানে কিছু কিছু মোছলমানও কালীপূজা করে। আমাগো দেশে কেউ তা সহ্য করে না। হিন্দুরাও আমারে দেখলেই দূর দূর করে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কি ইচ্ছে করে জান,

একটা কালী ঠাকুরের মূর্তি চেটে চেটে একেবারে খেয়ে ফেলি। তাইলে হিন্দুরাও আমারে পিটায়ে শেষ করবে, আর মোছলমানরাও খুন করবে।

লালনের চক্ষু দুটি গোল গোল হয়ে গেল। এ ধরনের কথা সে কখনও শোনেনি। এবারে কি এই লোকটির পাগলামি শুরু হল নাকি?

কালুয়া এক হাত তুলে অভয় দিয়ে বলল, না, না, ঠিক আছি। চলো, বাঁশের ঝাড়ের খোঁজ করি।

কিন্তু তখনই যাওয়া গেল না, অকস্মাৎ শুরু হল ঝড়-বৃষ্টি। জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টি আর লোকালয়ের মধ্যে বৃষ্টি তো এক রকম নয়। বজ্র-গর্জন ও অন্য প্রকার।

আখের রসটুকু ছাড়া সেদিন লালনের আর কোনও খাওয়া জুটল না। কিন্তু এখন সে ক্ষুধার তীব্র কষ্ট পেতে শুরু করেছে।

এত বৃষ্টির মধ্যে কিছুই করার থাকে না। দু'জনে শুয়ে রইল পেটে কিল মেরে। মাঝে ঘুম, আবার জাগরণ, আবার ঘুম। গাছতলায় শুয়েও বৃষ্টির দাপট থেকে নিষ্কৃতির কোনও উপায় নেই।

পরদিন উষার আলো নিয়ে এল একটা নতুন ভোর। আর বৃষ্টি নেই। আকাশ একেবারে ঠাকুর দালানের মতন ধোওয়া মোছা।

জেগে উঠে লালন দেখল, কালুয়া শেখ তখনও ঘুমন্ত, কিন্তু তার ঠোঁটে লেগে আছে হাসি। কিছু একটা সুখস্বপ্ন দেখছে বোধহয়।

লালন তাকে জাগাল না।

সে জোরে জোরে টাটকা বাতাসের নিশ্বাস নিল কিছুক্ষণ। গলায় একটু একটু ব্যথা। এ রকম বৃষ্টিতে ভিজলে সান্নিপাতিক হয়, তাতেও মানুষ মরে।

এক সময় পাশের ডোবায় হাত-মুখ ধুয়ে এল। ততক্ষণে কালুয়া জেগে উঠেছে। ফাঁকা দৃষ্টিতে লালনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

এই রে, কাল রাতের কথা সব ভুলে গেছে নাকি!

লালন বলল, আমি একজন মানুষ।

কালুয়া বলল, মানুষ? সাচাই নাকি? তুমি পা দুইখান উপরে আর মাথা নিচে, এই ভারে হাঁটতে পার?

লালন বলল, না। এইটা বুঝি মানুষের কাজ?

কালুয়া বলল, তুমি পার না, দ্যাখো, আমি পারি।

একবার ডিগবাজি খেয়ে সে পা দুটো তুলে দিল শূন্যে, মাথাটা ঝুলে রইল নিচে, সেই অবস্থায় দু'হাতে ভর দিয়ে চলে গেল খানিকটা।

আবার সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে সে বলল, তুমি যে কইলা, তুমি মানুষ, তুমি কী পার?

লালন বলল, আমি একটা অকর্মার ধাড়ি। আমি কিছুই পারি না।

কালুয়া বলল, ও, মনে পড়ছে। তুমি তো একখান পাগল। এই জঙ্গলে থাক। চল, তোমারে কাজ শিখায়ে দেব।

তার মাথায় যে-গামছাটা জড়ানো ছিল, সেটাও জলে ভিজে চুপচুপে। তবু সেটা দিয়েই সে মুখ-মাথা মোছার চেষ্টা করতে লাগল।

এ বনে সত্যিই বাঁশ ঝাড়ের অভাব নেই। এক এক স্থানে অন্য গাছ প্রায় নেই বললেই চলে, শুধু বাঁশবন। শেয়ালেরা এর মধ্যেই গর্ত খুঁড়ে থাকে। দু'চারটে পালাল এদিক-ওদিক। একটু দূরে কোথাও ক্যাঁ ক্যাঁ করে ময়ূর ডাকছে।

কালুয়া অভিজ্ঞ হাতে এক একটা বাঁশের গায়ে চাপড় মেরে দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। বাঁশ চেনা সহজ নয়, কোন বাঁশের কত বয়স তা বুঝতে হয়। সেই জন্যই বোধহয় কথায় বলে, বাঁশবনে ডোম কানা।

বাঁশেরও যে অনেক জাত আছে, তা লালন জানত না। কালুয়া তাকে বোঝাচ্ছে, পারুয়া, রুপাই, মাকাল বাঁশ, এই রকম বিভিন্ন নাম। এই সবের মধ্যে মুলি বাঁশ বেশি ভাল।

একটা জায়গা পছন্দ করে কালুয়া তার কুড়ুলটা লালনের হাতে দিয়ে বলল, প্রথমটা তুমি কাটো! এই গোড়া থেকে কাটতে হবে। নজর ঠিক রাখো। প্রথমে উপর দিক থেকে এক কোপ মারবে, তারপর নিচের দিক থেকে।

দ্বিতীয় কোপেই লালনের হাত থেকে কুড়ুলটা ছিটকে পড়ে গেল।

কালুয়া হেসে বলল, অত সহজ না। তাগৎ লাগে। মায়ের দুধ খাও নাই?

শিশু বয়সে মায়ের দুধ খেয়েছে কি না তা মনে নেই লালনের, কিন্তু কয়েকটা দিন যে সে সম্পূর্ণ অনাহারে রয়েছে, তা তো অন্য মানুষটি জানে না। সে কথা সে বলল না, আবার শুরু করল নবোদ্যমে।

প্রথম বাঁশটি ভূমিসাৎ করার পর তার বুকটা আনন্দে ভরে গেল। এই প্রথম সে যেন সার্থক হল একটা কিছুতে। পরিশ্রমে তার দুর্বল শরীরটা কাঁপছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে সারা মুখে।

কালুয়া বলল, থামলে হবে না, আবার আর একখান।

লালন খেটে চলেছে, কালুয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক।

কোনও কোনও বাঁশের গায়ে জড়িয়ে আছে এক রকমের লতানে গাছ, বড় বড় পাতা। কালুয়া একটা পাতা ছিঁড়ে মুখে দিল। খানিকটা চিবিয়ে আপন মনে বলল, হুঁ। মজা তো মন্দ না।

আর একটা পাতা ছিঁড়ে এনে সে লালনকে বলল, এইডা খাইয়া দ্যাখো তো মিঞা।

লালনের তেঁতুল পাতা খাওয়ার অভিজ্ঞতা ভাল নয়। সে ইতস্তত করতে লাগল।

কালুয়া ধমক দিয়ে বলল, খাও!

পাতাটা চিবোতে চিবোতে লালনের মনে হল স্বাদটা যেন চেনা চেনা। একটু একটু ঝাঁঝ, আবার মিষ্টত্বও আছে।

কালুয়া জিজ্ঞেস করল, এটা কীসের পাতা, বুঝলা কিছু?

লালন দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কালুয়া বলল, পান, পান, জংলি পান। সোয়াদ কিন্তু খারাপ না। তুমি আগে কখনও পান খাও নাই?

দীন-দুঃস্থ পরিবারে পান খাওয়া তো বিলাসিতা। বড় মানুষেরা খায়। লালন জীবনে একবারই একখিলি সাজা পান খেয়েছে। তার মামা বাড়িতে মাতামহের মৃত্যুর পর ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ হয়েছিল, নেমন্তন্ন খেয়েছিল গোটা পঞ্চাশজন। সেদিন লালনও পেট ভরে মণ্ডা-মেঠাই খেতে পেয়েছিল আর এক খিলি পানও জুটেছিল।

কালুয়া বলল, পানের দাম আছে। মেদিনীপুরের মানুষেরা পানের চাষ করে, তারে কয় পানের বরজ। জঙ্গলের মধ্যে বিনা পয়সার পান পাওয়া ভাগ্যের কথা। এখানেও তাইলে পানের চাষ করা যায়।

পট পট করে কয়েকটা পানপাতা মুখে দিতে দিতে সে আবার বলল, খাইয়া ল, খাইয়া ল, যে কয়টা পারোস!

এবার লালন বেশ কৌতুক বোধ করল। সেই শ্রাদ্ধ বাড়িতে লালন শুনেছিল যে, বেশি খাওয়া-দাওয়ার পর পান খেলে নাকি তাড়াতাড়ি সব হজম হয়। এখন তার পেটে এক দানা খাদ্যও নেই, এখন পান খেয়ে কী হজম করবে? নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে নাকি?

কালুয়া জোরে গান গেয়ে উঠল, 'ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারেও দিলে জমিদারি...'

লালন বলল, এ আবার কী গান? তুমি নিজে গান বানাও নাকি?

কালুয়া বলল, শোনো পাগলের কথা! আমার কি সে ক্ষ্যামতা আছে! মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কোথায় যেন শুনছি, মনে গেঁথে যায়।

লালন বলল, তার পর কী?

কালুয়া বলল, সব মনে নাই। দুই চাইর ছত্তর...

"প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম জারি
ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারেও দিলে জমিদারি
হুজুরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব টাকা কড়ি
আমারে ফিকিরে ফকির বানায়ে বসে আছ রাজকুমারী..."

কোনও ফকিরের গান মনে হয়। মোটকথা, বুঝলি তো, পান বেচেও জমিদার হওন যায়!

পানের রসে লালনের গলার ব্যথার বেশ আরাম হল।

মোট বাঁশ কাটা হল দশখানা। আর বেশি কেটে লাভ নেই, বয়ে নিয়ে যেতে হবে তো।

অনেক আগেই লালনের হাত থেকে কুড়ুলখানা নিজে নিয়েছিল কালুয়া। তার হাত অনেক দ্রুত চলে। বাঁশগুলোর ডগা আর ডালপালা ছেঁটে সে সমান মাপের করে নিল। তবু, দশখানা বাঁশ দুজনে বইবে কী করে?

মোটা মোটা কিছু লতা জোগাড় করে কালুয়া সব বাঁশগুলো গোছ করে বাঁধল। এবারে মাটিতে ফেলে দু'জনে একসঙ্গে টানবে। বেশ কিছু পান পাতাও সংগ্রহ করে নিল কালুয়া।

গ্রামের হাটে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। তখন প্রায় ভাঙা হাট। তবু বাঁশগুলো বিক্রি হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। কালুয়া পানের গোছের বদলে একসের ছোলা নিয়ে এল একটা মুদিখানা থেকে।

পাগলামির কোনও লক্ষণই নেই কালুয়ার। বেশ দরদামও করতে জানে।

এবার সে খরিদ করল কয়েকটা মাটির হাঁড়ি, মালসা ও কাঠের হাত। সেগুলো সে চাপাল লালনের ঘাড়ে। নিজের গামছার দু'দিকে বেঁধে নিল কয়েক সের চাল ও ডাল। দু'খণ্ড চকমকি পাথরও যেন সে জোগাড় করল কোথা থেকে।

তারপর বলল, এইবার চলো। জঙ্গলে গিয়া আমরা জংলি থাকুম না, সংসার পাততে হবে।

ফিরতে হবে অনেকটা পথ। লালন যেন আর খিদে সহ্য করতে পারছে না। সে মৃদু স্বরে বলল, আর একখান আউখ পাওয়া যায় না?

কালুয়া বলল, আর তো পয়সা-কড়ি নাই। তবু চলো, দেখি।

হাটের একপাশে এক ব্যাপারি বিক্রি করছে আখ, নারকোল, মানকচু এই সব। আলো পড়ে আসছে, সবাই ঘরে ফেরার পথ ধরেছে, আর খরিদ্দার পাওয়া দুষ্কর।

ব্যাপারির দিকে তাকিয়ে কালুয়া খুবই মোলায়েম গলায় বলতে লাগল, ভাইজান, একটা কথা কবো? আইজ তো আর...

লালন তার হাত চেপে ধরে বলল না। থাউক! চাই না। চলো—

তারদিকে কয়েক পলক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর কালুয়ার মুখ হাসিতে ভরে গেল। সে বলল, বুঝছি। ভিক্ষা করা যাবে না। প্রাণ যায় যাউক, তবু মান যেন থাকে। ঠিক। ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিকের উপর ঠিক। একশোবার ঠিক। রসুল ছাড়া আর কাউর কাছে ভিক্ষা চাইতে নাই।

আশেপাশে পড়ে আছে মানুষের ফেলে যাওয়া কয়েকটা আখের টুকরো। আধ-খাওয়া। একেবারে গোড়ার দিকটা শক্ত বলে অনেকে চিবোতে পারে ন।

সে রকম দু'তিনটে টুকরো তুলে নিয়ে সে বলল, এগুলি খাওনে দোষ নাই। এ হইল পথের দান। আমরাও পথের মানুষ।

হাট থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও একদিকে তাকিয়ে থেমে গিয়ে কালুয়া বলল, এই দুনিয়ায় আমাগো থেইক্যা আরও কত বড় পাগল আছে, দ্যাখবা? চলো দেখে যাই।

সেখানে দশ-বারোজনের ভিড় জমেছে, আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গ পাদ্রি। তার পরনে লম্বা সাদা জোব্বা, চুল-দাড়িও ধবধবে সাদা। হাতে একখানা কেতাব নিয়ে তিনি গদগদ স্বরে বলছেন, তোমা সব পাপী... নরকের দ্বার... প্রভু যিশু... পরম কল্যাণময়... আইস শরণ লও...

সাহেবের ধারণা, তিনি খুব শুদ্ধ বাংলা বলছেন, কিন্তু তাঁর উচ্চারণের জন্য এই শ্রোতারা প্রায় কিছুই বুঝতে পারছে না। তারা দাঁড়িয়ে আছে, এত কাছ থেকে শাসক জাতির একজন মানুষকে দেখার কৌতূহলে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে, চাবুক হাতে নীলকর সাহেবদের দেখা যায়। তাদের দেখলেই বুক কাঁপে। কিন্তু এই পাদ্রি সাহেবকে দেখলে বরং মায়া লাগে, ঘামে ভিজে তাঁর গায়ের জামা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে।

কালুয়া বলল, এমন পাগল দ্যাখছো আগে? সাত সমুদ্দুর পার হইয়া আইছে, আমরা নাকি সব পাপী, আমাগো উদ্ধার করবে! হাঃ হাঃ হাঃ! আরে বাপু, তোমার জাইত ভাইদের মতন, আমাগো চাবুক মারো, ঘরে আগুন দাও, গারদে ভরো, তার মানে বুঝি! জোর যার মুল্লুক তার। সোনাদানা যা আছে, নিয়া যাও! ধম্মের কথা আমারে কও ক্যান? তুমি যিশুর নাম জানো?

লালন বলল, হ জানি। সিরাজ সাঁই-এর কাছে শুনেছি।

কালুয়া অবাক হয়ে বলল, সিরাজ সাঁই? তুমি তারে চেন নাকি!

লালন বলল, একবার দেখছি।

কালুয়া বলল, আরে ওই সিরাজ সাঁই-ই তো আমারে পাগল করিছে। এক সময় কবো তোমারে তাঁর কথা। এখন চলো, আর দেরি করা যায় না। অন্ধকারে জঙ্গলের পথ...

হাটের এক ধারে গরু, ছাগল, ঘোড়াও বিক্রি হয়। দুটো ঘোড়া বিক্রি হয়নি, তার ব্যাপারি ফিরে চলেছে।

ঘোড়া দু'টির দিকে লালন সতৃষ্ণ নয়নে চাইল। ঘোড়া দেখলেই তার মনটা চনমন করে। কতদিন ঘোড়ায় চাপেনি। কবিরাজ মশাই বলেছিলেন, নিজে উপার্জন করে ঘোড়া কিনতে হয়। নইলে কপালে দুঃখ আছে। ঘোড়া কেনার সামর্থ্য তার কোনও দিনই হবে না। দুঃখ তার চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে।

একটা ছোট নদীর ওপরে বাঁশের সাঁকো। সেটা পেরিয়ে ওপারে যেতেই দেখা গেল, পথের এক ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন উলঙ্গ মানুষ। জীবিত না মৃত বোঝা যায় না। সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে এখন সঙ্গে অনেক হাট-ফেরতা মানুষ, কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না।

লালন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কালুয়া বলল, আহা রে। একদিন আমারও এই দশা হবে আমি জানি। রাস্তার ধারে পইড়্যা থাকব। কুকুর-বিড়ালেও ছোঁবে না।

লালন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে লোকটিকে উল্টে দিল। চমকে গিয়ে দেখল, লোকটি মৃত তো নয়ই, অজ্ঞানও নয়। চোখ চেয়ে আছে, পলকও পড়ল।

কালুয়া তাড়া দিয়ে বলল, চলো, চলো, নেশা-ভাঙ করছে বোধহয়।

লোকটি খুব ক্ষীণস্বরে বলল, সুলেমান ভাই, আমারে বাঁচাও।

কালুয়া বলল, এই দ্যাখো! এই ঘাটের মড়া আমার নাম জানলো ক্যামনে?

লালন লোকটিকে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল, পারল না।

সে কালুয়াকে বলল, তুমিও হাত লাগাও। এরে খাড়া করাই।

কালুয়া বলল, এরে তুইল্যা কী হবে? এখনও শ্বাস আছে, কিন্তু বাঁচনের আশা নাই। দ্যাখো না, মুখখান কালিবর্ণ। এর শিয়রে শমন।

লালন এবার প্রায় ধমক দিয়ে বলল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তুমি জানো না? ধরো, হাত লাগাও।

দু'জনে ধরাধরি করে তুলল বটে, কিন্তু লোকটির নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। প্রায় ফিসফিস করে বলল, সুলেমান ভাই, আমারে চিনলা না? আমি কাশেম।

কালুয়া বলল, না, চিনি না। আমি তো এহন পাগল। পুরানো কোনও কথাই মনে নাই। তোর কী হইছে?

লোকটি বলল, আমারে মারছে।

কালুয়া জিজ্ঞেস করল, কে মারছে?

লোকটি বলল, অরা।

কালুয়া আবার জিজ্ঞেস করল, অরা মানে কারা? কেন মারছে?

লোকটি বলল, রোজ মারে। আমারে মেরে ফেলাবে।

কালুয়া অধৈর্য হয়ে বলল, কী জ্বালা! কে মারছে, কেন মারে কবি তো!

লোকটি আবার বলল, মারছে। খুব মারছে।

কালুয়া লালনকে বলল, দোস্ত, এড়া পেরাণে বাঁচলেও পাগল হবার দেরি নাই। আমরা এডারে নিয়া কী করব?

লোকটি বলল, এট্টু পানি। বুক ফাইট্যা যায়।

লোকটিকে ধরে রাখার ভার কালুয়াকে দিয়ে লালু সাঁকোর নিচ থেকে মাটির হাঁড়ি ভর্তি জল নিয়ে এল।

লোকটি চোঁ চোঁ করে অর্ধেক হাঁড়ি জলই খেয়ে নিল। বাকিটা জল ঢেলে দিল নিজের মাথায়।

লালন বলল, তোমার বাড়ি কোন গেরামে? আমরা তোমারে দিয়া আসতে পারি।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, আমার গেরাম নাই। বাড়ি-ঘর সব গ্যাছে। আমারে দ্যাখলেই অরা মারবে আবার। তাইলে আমি কোথায় যাই? তুমি তো সবই জানো সুলেমান ভাই।

কালুয়া বলল, আমি কিছুই জানি না। আমি সুলেমান না, আমার নাম

কালুয়া। তুই যদি গেরামে যাইতে না পারবা, জঙ্গলে গিয়া থাক। আমাগো মতন।

লালুকে সে জিজ্ঞেস করল, এরে আমাগো সাথে জঙ্গল নিয়া যাব নাকি? তুমি কী কও?

লালু বলল, আমারে জিগাও ক্যান। আমি কি জঙ্গলের মালিক? কে মালিক, তাও আমি জানি না। যার ইচ্ছা সেই জঙ্গলে গিয়া থাকতে পারে।

কালুয়া এবার লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, কী রে, যাবি? হাঁটতে পারবি? ঘাড়ে কইরা তো নিতে পারব না।

লোকটি বলল, আমি এখন যাব না। আর একজন... তোমরা আমারে ওই গাছতলায় বসাইয়া দ্যাও। পানি খাওয়াইলা, আল্লা তোমাদের মঙ্গল করবেন। আমি এখন ঠিক আছি।

ওকে বসিয়ে দেওয়া হল একটা বটগাছের তলায়।

কালুয়া বলল, শোন, যদি জঙ্গলে যাইতে ইচ্ছা হয়, এই রাস্তা দিয়া যাবি, জঙ্গলের মধ্যে যেইডা সব থিকা বড় আর উঁচা শিমুলগাছ, তার ধারে আমাগো দেখতে পাবি।

লোকটি বলল, কী জানি, দেখি কী হয়!

আর একটু পরে কালুয়া আর লালন রওনা দিল।

অন্ধকার হয়ে গেলেও ওরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর দু'জনেই কাজে লেগে গেল দ্রুত।

মাটিতে গর্ত খুঁড়ে, শুকনো পাতা আর কাঠ-কুটো জোগাড় করে এনে জড়ো করা হল সেখানে। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে ফেলল কালুয়া। কাছের ছোট জলাশয় থেকে এক হাঁড়ি জল নিয়ে এল লালন, তার মধ্যেই কালুয়া একটা উনুন বানিয়ে ফেলেছে কোনওরকমে।

অন্য হাঁড়িটায় চাল আর ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। দু'জনে বসে রইল উনুনের দু'পাশে। খিচুড়ি রান্নার জন্য খুব একটা রন্ধন বিদ্যা জানার দরকার হয় না। মশলাপাতি ব্যবহারের প্রশ্নই নেই, নুন ছাড়া আর আনা হয়নি কিছুই।

কিছুক্ষণ পরেই খিচুড়ির গন্ধ পাওয়া গেল।

এই রাত্তিরে আর কলাপাতা পাওয়া যাবে কোথায়। কাছাকাছি কলাগাছ নেই ওরা জানে। কাল দেখা যাবে। ওরা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। দু'জনেই হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খিচুড়ি খেতে লাগল গরম গরম।

একটু পরে থেমে গিয়ে কালুয়া বলল, ছয়। তুই কয়বার?

লালন বলল, গুনি নাই তো।

কালুয়া বলল, এইবার থিকা তুই একবার, আমি একবার। ইস, কয়েকখান কাঁচা মরিচ পাইলে কী ভালই হইত রে!

তারপর সে গান ধরল, ডাইল রান্ধো রে, কাঁচা মরিচ দিয়া/ গুরুর কাছে লওয়া মন্তর বিরলে বসিয়া/ ও মন ডাইল রান্ধো রে...

গান থামিয়ে সে বলল, আমার মা কইত, খাইতে খাইতে গান গাইলে বউ পাগল হয়! হায়রে কপাল, আমার বউ জুটল না, আমিই হইলাম পাগল।

নিজের রসিকতায় সে নিজেই হেসে উঠল।

প্রায় এক হাঁড়ি খিচুড়ি শেষ হতে দেরি হল না।

তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে কালুয়া বলল, কী ক্ষুধাই পাইছিল, আর একটু হইলে বাপের নাম ভুইল্যা যাইতাম।

লালন বলল, আত্মার শান্তি হইল। এত ভাল খিচুড়ি আমি জন্মে খাই নাই।

আরও কাঠ এনে ঠেসে দেওয়া হল আগুনে। এই আগুন সারা রাত জ্বললে জন্তু-জানোয়ার আসবে না।

সেই আগুনের দু'পাশে শুয়ে দু'জনে এক ঘুমে কাবার করে দিল রাত। সকাল থেকেই কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গেল।

প্রথম কাজই হল, আরও বাঁশ কেটে বয়ে আনা। আগে ঘরের মতন ছাউনি বানাতে হবে। নইলে এই বর্ষার মধ্যে জঙ্গলে টেকা যাবে না।

কালুয়া না থাকলে লালনের পক্ষে একা ঘর বানানো সম্ভব হত না বোধহয়। কালুয়া এ কাজ সত্যিই ভাল জানে, সে পাকা ঘরামি। লালনের খালি আশঙ্কা, কালুয়া কখন পাগলামি শুরু করবে। এতক্ষণ পর্যন্ত সেরকম কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। শুধু মাঝে মাঝে বিচিত্র সব গান গেয়ে ওঠে।

তৃতীয় দিনে, তখনও ঘর তৈরির কাজ চলছে, বিকেলের দিকে দেখা গেল, একজন রমণীর কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে একজন পুরুষ।

ঘর্মাক্ত শরীরে, বিরক্ত হয়ে কালুয়া বলল, কী আপদ? এ আবার কারা আসে?

লালন বলল, এই মানুষটারেই তো দেখেছিলাম পথের পাশে শুয়ে থাকতে।

কালুয়া বলল, এখানে কে আসতে কইছে? অরে মরার জায়গা পাইল না?

লালন বলল, বাঃ, তুমিই তো আসতে কইছিলা!

কালুয়া বলল, তাই নাকি? কিছুই মনে থাকে না। আমরা দুই পাগলেই তো বেশ শান্তিতে ছিলাম। অগো খেদামু? ভয় দেখামু?

লালন বলল, কেন, খেদাবে কেন? যার ইচ্ছা আসতে পারে। আমাগো চাইল-ডাইলে ভাগ না বসাইলেই হইল।

কাছে আসার পর পুরুষটি বলল, সুলেমানভাই, আমি কাশেম। আইস্যা পড়লাম।

কালুয়া গম্ভীরভাবে বলল, বেশ করছো। রাত্তিরে কী খাবা? সে খেয়াল আছে? চাইল ডাইল আনছো? এহানে যার যার খাদ্য নিজের নিজের। আমাগো কোনও দায়িত্ব নাই।

রমণীটি বলল, নিজের নিজের কেন হবে? সকলডি একসাথে খাইতে পারি না? চাইল-ডাইল যথেষ্ট আনছি, চিড়া-মুড়ি-গুড়ও আছে।

কাশেম বলল, সুলেমানভাই, আপনে তো অরে চেনেন!

কালুয়া ধমক দিয়ে বলল, না চিনি না। আমি কারুকে চিনি না। আমি কারুর ভাই-টাইও না। আমি কোনও ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে কিছু খাই না। তাতে আমার জাত যাবে।

লালন হেসে বলল, তুমি কইলা, তুমি চেন না। তবে জানলে কী করে যে, ব্রাহ্মণ কন্যা?

রমণীটিও মুচকি হেসে বলল, আমারে চেনেন। আমার বাবা, ছোট খুড়ারেও চেনেন।

ওদের সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটা পোঁটলাপুঁটলি। সেগুলি মাটিতে নামানোর পর রমণীটি লালনকে বলল, আপনেরও কি আমার হাতের কিছু খাইলে জাত যাবে নাকি?

লালন বলল, হাতের বুঝি জাত থাকে? জাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যই তো জঙ্গলে পলায়ে এসেছি।

সে আবার বলল, আমি কিন্তু পতিত।

কালুয়া চিৎকার করে বলল, আঃ, অত কথার কী আছে? এখন কাজের সময়। যাও দোস্ত হাত লাগাও। রাইতে আবার বৃষ্টি আসতে পারে।

ঘর বানাবার খুঁটি পোঁতা হয়ে গেছে। বাঁশ ছুলে ছুলে, লতার বাঁধন দিয়ে কালুয়া কোনও মতে একটা ছাউনি বানিয়ে ফেলেছে। সেটাই ধরাধরি করে চাপিয়ে দেওয়া হল ওপরে। একটা ঘর হল বটে, কিন্তু তার কোনও দেয়াল নেই, দরজা নেই। তবু বৃষ্টির সময় মাথা বাঁচান যাবে।

রমণীটির নাম কমলি। তার বেশ ব্যক্তিত্ব আছে, শরীরও বেশ মজবুত। মাথায় চুল নেই, কদমছাঁট দেওয়া, তাতেই বোঝা যায়, সে হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। চক্ষু দু'টি টানা টানা। নাকও বেশ চোখা। বয়েস হবে বিশ-বাইশ।

কাশেমের কোনও কাজ করার ক্ষমতা নেই। সে শুয়েই রইল। লালন আর কালুয়া যখন ঘর বাঁধায় ব্যস্ত, কমলি তখন পোঁটলা-পুঁটলি খুলে সাজিয়ে ফেলল সব জিনিসপত্র। তারপর উনুনে রান্না চাপিয়ে দিল সে।

যেন এটা তার সংসার। অন্ধকার হয়ে যাবার পর সে সংসারের কর্ত্রীর মতনই অন্যদের ডাক দিয়ে বলল, সকলে খাইতে আসেন। বইস্যা পড়েন।

রান্না তো হয়েছে দুটো হাঁড়িতে, কিন্তু থালাবাসন তো নেই। আজও কলাপাতা জোগাড় করা হয়নি। খাওয়া হবে কিসে?

ডাল আর ভাত আলাদা রান্না হয়েছে। তার সঙ্গে আখের গুড়।

লালন বলল, ভাত আর ডাইল পৃথক রেখে কী হবে, এক হাঁড়িতেই ঢালো। পেটে গেলে তো সব একই হয়ে যাবে। এই জন্যই খিচুড়িতে সুবিধা। এই হাঁড়ির মধ্যে সকলে হাত ডুবায়ে ডুবায়েই খেতে হবে, তাছাড়া তো উপায় নাই। কাইল অন্য ব্যবস্থা দেখা যাবে।

কমলি অবিশ্বাসের সুরে বলল, সকলে একসাথে খাবে?

লালন নিজেই ভাতের হাঁড়ির মধ্যে সব ডাল ঢেলে দিয়ে ঘেঁটে দিল। তারপর বলল, এক সাথেই খাওয়া হবে, কেউ বেশিও খাবে না, কমও না।

কালুয়া বলল, এই আমি শুরু করলাম।

কমলি হাত গুটিয়ে বসে রইল।

লালন তাকে বলল, নাও, শুরু করো!

কমলি জিভ কেটে বলল, মেয়ে মানুষদের আগে খাইতে নাই। আগে পুরুষরা খাবে—

কালুয়া হুংকার দিয়ে বলল, চোপ! মেয়েমানুষ আবার কী! এখানে কেউ মেয়ে নাই, পুরুষ নাই। কেউ যেন এই সব কথা না কয়!

লালন বলল, তুমি না হাত দিলে আমরাও খাব না। হাত লাগাও!

এবারে চারটে হাত ঢুকল হাঁড়ির মধ্যে। অথচ কাড়াকাড়ি নেই।

কালুয়া একটু পরে বলল, ধুত্তোর! সোয়াদ নাই। রাঁধতে জানে না। মরিচ সম্ভার না দিলে কি ডাইল হয়!

কমলি বলল, হাট থেকে মরিচ, হলদি আরও মশল্লা এনে দিও। তখন দ্যাখবা, এই হাতের রান্নার কেমন সোয়াদ হয়।

লালন বলল, কালুয়া, তুমি কেন কইলা, ওর হাতে খেলে তোমার জাত যাবে?

কালুয়া বলল, মোছলমানের ছোঁওয়া খেলে হিন্দুর যদি জাত যায়, তবে হিন্দুর ছোঁওয়া খেলে মোছলমানের কেন জাত যাবে না!

কমলি বলল, ওঃ, ভারি তো মোছলমান! এবাদত জানে না।

লালন বলল, তুমিই তো আগে কইছিলা, পাগলের জাত থাকে না।

কালুয়া ভাবল, তাই তো আমি ভাবি, কখন বেশি পাগল হব। এই যে এখন ঠিকঠাক আছি, এইটাই ভাল লাগে না!

এর পর বৃষ্টি নামল। তবে জোরে নয়, ইলশেগুঁড়ি। ছাউনির মধ্যে আশ্রয় নিল চারজনে।

আজ বড় বেশি শিয়াল ডাকছে। কুক কুক করছে একটা রাত পাখি। জলাশয়ের কাছটায় বড় কোনও জানোয়ারের দাপাদাপি শোনা গেল। কিন্তু চন্দ্রলুপ্ত রাত, মিলেমিশে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

দরজাহীন ঘরে যদি কোনও হিংস্র জানোয়ার ঢুকে পড়ে বেশি রাতে? ছাউনি তৈরির জন্য বাঁশ কাটার সময় দু'খানা লাঠি বানাবার সরু বাঁশও কাটা হয়েছে।

লালন তার একখানা রাখল মাথার কাছে।

মাটির ওপরে পাশাপাশি শুয়ে রইল চারজন। একটুক্ষণ কারওর মুখে কোনও কথা নেই। তারপর কালুয়া একটা গান গেয়ে উঠল।

রহমান রহিম আল্লা তুমি ওগো মকরউল্লা
তুমি মক্করেতে ধর কায়া, কোন আকারে কী রূপছায়া
কোন নাম ধরে দিলেন দেখা, কোন নূরে নূরতে জেল্লা
নামটি তোমার নিরঞ্জন
রেখেছিল কে কখন...

হঠাৎ গান থামিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

লালন উদ্বিগ্ন হয়ে মাথা তুলে বলল, কী হইল দোস্ত? কী হইল?

কান্না না থামিয়ে কালুয়া বলল, কিছু না। কিছু হয় নাই!

কাশেম বলল, এইটাই তো ওনার অসুখ! একবার কান্না শুরু হইলে আর থামে না।

লালন এই ক'দিনের মধ্যে এমন দেখেনি। হাসি-ঠাট্টাতেই তো ওর ঝোঁক বেশি। আজ একেবারে শিশুর মতন কাঁদছে।

লালন আবার জিজ্ঞেস করল, কষ্ট হইতাছে কিছু?

কালুয়া বলল, না, না, না, না।

তবু কান্না থামল না।

কাশেম বলল, কমলি, তুই একখান গান গা। তাতে যদি থামে।

কমলি একটু গুনগুন করে গাইতে শুরু করল। তার গলাখানি বেশ।

মা মা বলে আর ডাকব না
ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে
মা বুঝি রয়েছে চক্ষুকর্ণ খেয়ে
মাতা বর্তমানে এ দুঃখ সন্তানে
মা বেঁচে তার কী ফল বলো না...

এ গান শুনেও কান্না থামল না কালুয়ার। একজন মানুষ এমনভাবে কেঁদে চললে কি পাশের মানুষদের ঘুম আসে?

একটু পরে লালনও একটা গান গেয়ে উঠল আপন মনে:

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছেন
মন মতো মনোহরা।
ঘরের আট কুঠরি নয় দরোজা
আঠার মোকান চোদ্দো পোয়া
দুই খুঁটিতে পাড়া সুসারা।

ঘরের বায়ান্ন বাজার তেরপান্ন গলি
ওই বাজারে বেচাকেনা
করে মন চোরা...

কমলি বলল, সাঁই, এটা কোন ফকিরের গান? আগে তো শুনি নাই!

কাশেম বলল, আমিও শুনি নাই। আপনিই রচেছেন বুঝি?

লালন বলল, সাঁই? আমি সাঁই টাঁই কিছু না। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। কোনও দিন সাধনাও করি নাই। এ গান কার রচনা তাও জানি না। মাঝে মাঝে আমার কী যেন হয়, মনের ভিতর থেকে গান বাইরাইয়ে আসে। কার গান, কবে শিখেছি, কিছুই বুঝি না। মনে লয় যেন আমার মনের মধ্যে আর একটা মানুষ লুকায়ে আছে। সে যে কে, তাও জানি না। সে-ই গান বেন্ধে আমারে দিয়া গাওয়ায়। ইচ্ছা করলেও সব সময় গাইতে পারি না। তার যখন ইচ্ছা হবে, সে আমার গলা দিয়া গাওয়াবে। তোমাগো এমন হয়?

কাশেম বলল, কী যে কন! আমরা তো চোখ থাকিতেও অন্ধ। মনের খবরও জানি না। যে মনের মানুষের কথা ট্যার পায়, তারেই তো সাঁই কয়। আহা কী গান শুনাইলেন!

লালনের গানের মাঝখানেই কালুয়ার কান্না থেমে গেছে।

সে এবার বলল, চুপ কর তো। ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। এ গানের মর্ম বুঝিছিস কিছু? 'ঘরের আট কুঠরি নয় দরোজা', এ কেমনতরো ঘর? তোরা বুঝবি না। এ অতি গুহ্য কথা।

লালন বলল, আহা, অমন ধমক দেও ক্যান। আমিও তো বুঝি না।

কালুয়া বলল, তোমার বুঝার দরকার নাই। তোমারে ভূতে পাইছে। সেই ভূতই তোমারে দিয়া গাওয়াবে। সেই ভূতের নাম নিরঞ্জন। এইবার সবাই ঘুমাও।

লালন বলল, তুমি এত কাঁদছিলা কেন? কীসের কষ্ট হতেছিল?

কালুয়া বলল, আমার কথা ছাড়ান দাও। আমারেও ভূতে ধরে, তবে সে আমার চোদ্দো পুরুষের ভূত। সে ভূতরে না তাড়াইলে আমি শান্তি পাব না।

এবার সবাই চুপ করে গেল। দূরে কোথাও রাত পাখিটা ডেকেই চলেছে। থেমে গেছে বৃষ্টি, তবু গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা।

৮

মাস দুয়েকের মধ্যে জঙ্গলের এই শিমুলতলায় এসে আশ্রয় নিল আরও বাইশজন মানুষ। গ্রাম থেকে দূরে, সমাজ থেকে দূরে, এখানে গড়ে উঠছে নতুন বসতি।

এরা সবাই দীন-দুঃখী, নির্যাতিত-নিপীড়িত, ছন্নছাড়া। কী করে যেন রটে গেছে, এই বনের মধ্যে একবার ঢুকে এলে, নিজের ইচ্ছে মতন বাস

করা যায়। এখানে জমিদারের পেয়াদা আসে না। মোল্লা-পুরুতরা চোখ রাঙায় না। জমির কোনও মালিকানা নাই, যার যেমন সামর্থ্য ঘর তুলে নিতে পারে। দু'বেলা ক্ষুধার অন্ন জুটুক বা না জুটুক, শান্তি আছে।

এদের মধ্যে কেউ হিন্দু আর কেউ মুসলমান, উভয় সমাজেরই একেবারে নিচের তলার মানুষ। এদের তেমন কিছু সহায়সম্বল আগেও ছিল না, এখনও নেই, কিন্তু এখানে আছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে মুক্তি।

সকাল থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খাটাখাটনি শুরু করে। জঙ্গলেও কোনও না কোনওভাবে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। লালন নিজেই যেমন পান চাষ শুরু করেছে। তাল গাছের রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে তালগুড়। কেউ কেউ গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে দিন-মজুরি খেটে যা পারে উপার্জন করে ফিরে আসে সন্ধের আগে।

এরমধ্যেই ছড়িয়েছিটিয়ে দশ-বারোটা ঘর উঠে গেছে। যার যার নিজের রান্নার ব্যবস্থা। কে কী খেল, তা নিয়ে অন্য কেউ মাথা ঘামায় না। শুধু কমলি সব খবর রাখে। সারাদিন সে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক ঘরে একবার করে উঁকি মারে। যদি কারওর ঘরে একেবারেই আগা না ধরে, সেই একজন-দু'জন মানুষকে ডেকে আনে নিজের ঘরে। তার হাতে কিছু পয়সা আছে, সঙ্গে এনেছিল। কাশেম এখনও দুর্বল শরীর নিয়ে কাজকর্ম করতে পারে না, কারা যেন মারের চোটে তার মাজা ভেঙে দিয়েছে। দু'চারদিন অন্তর অন্তর এখানকার কিছু কিছু মানুষ কাছাকাছি হাটে চাল-ডাল কেনাকাটি করতে যায়, কমলিও যায় তাদের সঙ্গে।

সন্ধের সময় সবাই মিলে একটা খোলা জায়গায় বসে। এই সময়টাই যেন এখানকার শ্রেষ্ঠ সময়। হাসি-মশকরা হয়, যে যেমন পারে গান গায়। তখন কারওর সঙ্গে কারওর ভেদাভেদি কিংবা রেষারেষি থাকে না।

কেউ কিছু ঠিক করেনি, তবু সবাই যেন এখানকার নেতা হিসেবে লালনকে মেনে নিয়েছে। লালন মোটেই নেতা হতে চায় না, সব সময় সে বলে, ওরে আমি কেউ না, এই জঙ্গল-জমি আমার নয়, এখানে সবাই সমান। সে যত নেতৃত্ব অস্বীকার করতে চায়, তার মান্যতা বাড়ে। তার সাঁই নামটাও রটে গেছে।

এই সব নিপীড়িত মানুষেরা সমাজে থাকার সময় সবসময় কারুর না কারুর মোড়লগিরি সহ্য করেছে, তাদের পায়ের ধুলো চেটেছে। এখানে সমাজ নেই। তবু এমন একজনকে সকলেই চায়, যার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়। যারা নতুন আসে, অন্য কারুর সঙ্গে তার ঠোকাঠুকি লাগতেও পারে, মানুষের স্বার্থবোধ যে যায় না সহজে। কেউ কেউ পুরনো ঝগড়া সঙ্গে নিয়ে আসে।

লালন নেতা হতে চায় না, তবু তার চরিত্রে যেন এক নতুন ব্যক্তিত্ব এসেছে। সে আগে লালু ছিল, জঙ্গলে আসার পর লালন হয়েছে, এ যেন দুইজন মানুষ। আগে যারা লালুকে চিনতো, এখন তাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগবে। এখন লালন কোনও কথা বলতে শুরু করলে সবাই মন দিয়ে শোনে। কথা তো সে নিজে বলে না, তার ভিতরের অন্য মানুষটা বলে।

দুদ্দু শাহ নামক এক ব্যক্তি এসে একদিন নালিশ করল, সে যখন ফজরের নামাজ পড়ছিল, তখন দোলাই নামক একজন পিছন থেকে এসে ঠেলা মেরেছে। সে তখন তাহারিয়া অবস্থায় ছিল, ঠেলা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তাতে তার নাকে আঘাত লেগেছে।

এই অভিযোগ শুনে লালন কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল দোলাইয়ের দিকে। তাকে ভর্ৎসনা না করে হাসল। বলল, বেশ করেছ। তোমার মন যা চেয়েছে তাই করেছ।

তারপর দুদ্দু শাহের দিকে চেয়ে বলল, কাল ফজরের নামাজের সময় আমারে ডাক দিবা। আমিও তোমার পাশে বইস্যে নামাজ পড়ব।

দোলাই বিদ্রুপের সুরে বলল, তুমি নামাজ পড়বা? তুমি নামাজের কী জানো?

লালন বলল, না জানলেও শিখে নিতে ক্ষতি কী?

দোলাই বলল, লায়েক হবার পর আমিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছি। কী হয় তাতে, কিছুই হয় না! কত মার খেয়েছি, দারিদ্রের জ্বালায় মরতেও বসেছি কয়েকবার, তবু আল্লাতালা মুখ তুলে তাকাননি। তিনি গরিবদের দেখেন না।

লালন বললেন, যার হয়, তার হয়। তার হবে। হয়তো আমারও হবে। তোমার হয় নাই। কিছু পাও নাই। তুমি বসে বসে কান্দো।

দোলাই বলল, সাঁই, তুমি আগে হিন্দু আছিলা, আমি জানি। এখন মোছলমান হইছ? বেশি বেশি, তাই না! নামাজ পড়তে চাও?

লালন বলল, প্রতিদিন পারব কি না জানি না। তবে শিখতে চাই অবশ্যই!

দোলাই বলল, হিন্দু যখন নতুন মোছলমান হয়, তখন বেশি বেশি গরু খায়। আমি অনেক দেখেছি।

লালন বলল, আমি আগে হিন্দু আছিলাম ঠিকই। এখন মোছলমান। কেরেস্তানও কইতে পারো। আমি ধর্ম মানি, ধর্মভেদ মানি না। জাতি মানি, জাতিভেদ মানি না। আমার অন্তরাত্মা কয়, আমরা সকলেই মানুষ, শুধু এইটুকু মানলেই বা ক্ষতি কী? আমার অন্তরাত্মা কি কয় জানো? তুমি তোমার ধর্মের সব কিছু মান্য করেও শান্তি পেতে পারো। আবার কোনও কিছুই না মেনে, পুজো আচ্চা-নামাজ সব বাদ দিয়ে, শুধু মানুষকে ভালবেসেও একটা সুন্দর জীবন পাওয়া যেতে পারে।

দুদ্দু শাহ বলল, এ তুমি কী বলছো সাঁই! ধর্ম না মেনেও!

লালন হাসতে হাসতে বলল, ও গো, আমার বিদ্যা ফুরায়ে গেছে, আর কিছু বলার নাই। এসো, গান ধরি। তোমরাও গান গাও!

খোলা আকাশের নিচে বসে শুরু হয় গান।

লালনের শুধু এইটুকু কথার জেরেই দোলাই আর দুদ্দু শাহের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটে গেল, এমন নাও হতে পারে। হয়তো আরও কিছু ঘটেছিল। কিন্তু দুইদিন পরেই দেখা গেল, দুদ্দু আর দোলাইয়ের গলায় গলায় ভাব।

প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন মানুষ আসছে। কেউ তাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে না, আবার ফিরিয়েও দিচ্ছে না। গাছ কাটার দরকার হচ্ছে না, ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় উঠছে নতুন ঘর। কী করে যেন এই নতুন বসতির নাম হয়ে গেছে শিমুলতলা।

কালুয়াকে বেশ কয়েকদিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লালনকে সে কিছুই বলেনি, কারুর সঙ্গে তার মনোমালিন্যও হয়নি, তবু সে উধাও হয়ে গেছে।

লালন তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না, তার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কালুয়া কেন এখান থেকে চলে গেছে, তা লালন বুঝল একদিন রাতে।

তাদের চালা ঘরটির এখন আরও উন্নতি হয়েছে। ফাঁক-ফোঁকর সব বন্ধ করা গেছে, বৃষ্টি আর একেবারেই ঢোকে না। দরজা অবশ্য বসানো হয়নি। তার প্রয়োজনও বোধ করে না লালন। সে একা শুয়ে থাকে।

প্রায় মধ্য রাত, সবাই যখন সুষুপ্ত, তখন একটা গান শুনে লালনের ঘুম ভেঙে গেল।

গানটি নারী কণ্ঠের। আজ বাইরে জ্যোৎস্না আছে। শূন্য দরজার কাছে দেখা গেল এক রমণী মূর্তি। কয়েক মুহূর্ত পর ঘোর কাটতেই লালন বুঝল, এ ছায়া মূর্তি কমলির। তবু সে বলল, কে?

কমলি বলল, আমি গো আমি, অভাগিনী কমলিনী। সাঁই, আজ আমার ঘুম আসছে না কিছুতেই। তোমার এখানে একটু বসতে পারি?

লালন বলল, বসো। কাশেম কী করে?

কমলি বলল, সে তো ঘুমায়ে একেবারে অজ্ঞান। ওর সর্বাঙ্গে ব্যথা, তাই ঘুমাইলেই শুধু শান্তি পায়। তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম।

লালন বলল, তাতে কিছু হয় নাই। তুমি কী গান গাইছিলে, সেইটা গাও।

কমলি লালনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, নাঃ! সে গান আর নাই। এমনিই দুইডা কথা কই। সাঁই, তুমি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানো?

লালন একটু ইতস্তত করে বলল, বিশেষ কিছু জানি না, যতদূর শুনেছি, তুমি এক ব্রাহ্মণ বাড়ির বিধবা, পরে কাশেমরে শাদী করছো—

কমলি বাধা দিয়ে বলল, না, না, ঠিক না। কাশেমের সাথে আমার শাদী হয় নাই। আমি একটা নষ্ট, পতিত মাইয়া মানুষ। এক রাক্ষুসী! বামুন বাড়িতে জন্ম ঠিকই, বিয়া হইছিল নয় বছর বয়সে। মাইয়া মানুষ কত বয়েসে রজঃস্বলা হয়, তুমি জানো? আমার তা হবার আগেই আমার সোয়ামি যমের ঘরে যায়। তার আর আমার দুই জনেরই ওলাওঠা হইছিল, সে গেল আর আমি বাঁইচ্যা রইলাম। সবাই কইলো, আমিই আমার

সোয়ামিকে খাইছি। ঠিক কিনা? কও?

লালন বলল, না। মানুষ মানুষরে খায় না।

কমলি বলল, লোকে তো তবু মাইয়া মানুষের নামে কয়, আরও কত কী কয়! শ্বশুরবাড়ি থিকা আমারে খেদাইয়া দিল, বাপের বাড়ি ছাড়া গতি নাই। সেইখানে দিনের পর দিন...

লালন বলল, জানি। বিধবা কন্যাদের বাপের বাড়িতে কেমন ভাবে থাকতে হয়।

কমলি বলল, না, জানো না। মাইয়া মানুষের কত বিপদ, কত কষ্ট হয়, তা কোনও পুরুষই ঠিক ঠিক জানতে পারে না। দিনের পর দিন ছুতানাতায় উপাস, এটা খাবা না, ওইটা করবা না, দিনের পর দিন কত রকম অত্যাচার। বিধবা যত তাড়াতাড়ি মরে ততই সংসারের মঙ্গল। আর এমনই বিড়ালের মতন কড়া জান বিধবাদের, তারা সহজে মরেও না। আর সবাই বাঁচবে, আর আমি কেন মরব, কইতে পারো? আমি মরতে চাই না।

লালন বলল, এইখানে বাঁচবে, আর ভয় নাই।

কমলি বলল, শোনো, আমার কথা শ্যাস হয় নাই। আমারে প্রথম নষ্ট করে আমার আপন ছোটখুড়া। আমার বয়স তখন ষোলো। এই কথা যদি আমি সর্বসমক্ষে চ্যাঁচাইয়া চ্যাঁচাইয়া কই, কেউ মানবে না, বিধবারই তো সব দোষ হয়। আরও লাথি, ঝাঁটা খেতে হবে। এইবার তোমারে একটা সত্যি কথা কমু, সাঁই? কাউরে না কাউরে খুব কইতে ইচ্ছা করে।

লালন বলল, কও। মিথ্যা কথা শুনাবার জন্য নিশ্চয় তুমি এত রাইতে আসো নাই।

কমলি বলল, ছোটখুড়া আমারে যখন নষ্ট করে, তখন আমার ভয় হয় নাই, পাপের কথা ভাবি নাই, বড় সুখ হইছিল, বুকের মইধ্যে যে-আগুন জ্বলতে ছিল, সেই আগুন যেন জ্যোৎস্নার আলো হইয়া গেল! এইটা কি পাপ! কয় হিন্দু বিধবার বুকে যখন তখন এমন আগুন জ্বালেন ক্যান? মোছলমান, কেরেস্তান বিধবাদের দুই-তিনবার বিয়াতেও দোষ নাই, হিন্দুর ভগবানের এ কেমনধারা বিচার? হিন্দুর ভগবান ক্যান এত নিষ্ঠুর? তুমি কও!

লালন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, এ কথা আমারে জিগাইয়ো না কমলি। ভগবানের বিচার করার ক্ষমতা আমার নাই।

কমলি আবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আমার ছোটখুড়াটা একটা শয়তান। তিন তিনবার লুকাইয়া আমার সাথে এ কাম করছে, অথচ দিনের বেলা সবার সামনে কী খারাপ ব্যবহারই না করে। দাঁত খিঁচায়। যেন আমি একটা ঘৃণ্য প্রাণী। আমি কেন্দেছি, গোপনে গোপনে অনেক কেন্দেছি, তবু আমার বুকের আগুন নেভে না, মাঝে মাঝে দপ করে জ্বইল্যা ওঠে। তখন বড় কষ্ট হয়। একদিন বোঝলাম, আমি রাক্ষুসী, আমার পুরুষ মানুষ চাই। ঠিক করলাম, ঘর ছাড়ব। কিন্তু কার সঙ্গে? কোনও হিন্দু পুরুষের সাহস হবে না। কেউ আমারে নিজের করে নেবে না। একজনরে মনে ধরছিল। বড় ভাল মানুষ, চেহারা খানাও ছিমছাম। আমার বাপের বাড়িতে একখান নতুন ঘর ছাওয়া হইতেছিল, সে একজন ঘরামি, কাজের সময় একটু একটু গানও করে। সে মোছলমান, জাতে আমার মোটেই আপত্তি নাই। সে মানুষটা বিয়ে-শাদীও করে নাই, আমি দুই-চারবার কথা কয়েছি তার সাথে, তার কথা শুনলে বুকে দোলা লাগে। সে কে তুমি আন্দাজ করতে পারো?

লালন বলল, আমি কি তারে চিনি?

কমলি বলল, তার নাম সুলেমান মির্জা।

লালন খুবই চমকে উঠে বলল, সুলেমান? আমাগো কালুয়া?

কমলি বলল, হ। সে আবার কালী পূজা করে, তুমি জানো?

লালন বলল, কালী পুজো করে কি না তা জানি না। তবে মা কালীর ভক্ত, তা শুনেছি। মায়ের গান গায়।

কমলি বলল, মা কালীরও ভক্ত আবার সিরাজ সাঁই-এরও চ্যালা। আসলে একটা ভিতুর ডিম। সে আমারে নিতে সাহস পাইল না, আমাগো বাড়ির কাজ ছাইড়া পিঠটান দিল, তারপর এই কাশেম। সেও কাজ করত আমাগো বাড়িতে।

লালনের প্রায় স্তম্ভিত হবার মতন অবস্থা। কালুয়া কেন প্রথম থেকেই কমলিকে পছন্দ করেনি, তা সে বুঝতেই পারছিল না। কমলি তাকে নিজস্ব পুরুষ হিসেবে চেয়েছিল, আবার সেই কমলিই এখানে তার চোখের সামনে। কালুয়া নিজেই তো কাশেমকে এখানে আসতে বলেছিল। আবার ওদের সহ্য করতে পারেনি বলেই কি এখান থেকে সহসা চলে গেল? নিয়তির কী বিচিত্র লীলা!

কমলি বলল, আমার জন্যই কাশেম এত মাইর খাইছে। মইরাই যাইতে পারত। আমারই দোষ। আমিই তো ওরে ভুলাইছি। কিন্তু আমারে একবারও দোষ দেয় না। ও এখন আর কিছুই পারে না। কিছুই না।

লালন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, কোনও অঙ্গের তো ক্ষতি হয় নাই। ধীরে ধীরে সাইরা ওঠবে।

কমলি একটু এগিয়ে এসে লালনের পায়ে হাত দিয়ে বলল, সাঁই, তোমারে একটা কথা জিগাই। তুমি কি পাথর?

লালন বলল, না। পাথর কেমনে হবো। আমি আর সকলেরই মতন রক্ত মাংসের মানুষ।

কমলি দু'হাত দিয়ে লালনের পা ঘষতে ঘষতে বলল, রক্ত মাংসের মানুষ, কিন্তু তোমার কামনা-বাসনা নাই?

লালন বলল, থাকবে না ক্যান? সাধারণ মানুষের যেমন থাকে।

কমলি এবার মিনতির সুরে বলল, তয় তুমি আমারে লও।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে লালনও মিনতির সুরে বলল, আমারে তুমি ক্ষমা করো কমলি।

কমলি ব্যাকুলভাবে বলল, ক্যান, ক্যান, ক্ষমার কথা আসে ক্যান?

লালন বলল, তুমি এর মইধ্যে দু'তিনবার আমার দিকে চেয়ে চক্ষু তরল করেছ। তার মানে কি আমি বুঝি না! ঠিকই বুঝি। কিন্তু আমার মনের মইধ্যে যে আর একটা মানুষ আছে, সে আমারে নির্দেশ দেয়। সে আমারে কয়, রমণী রত্ন অতি দুর্লভ। এ তেমনই রমণী। কাশেম নামে একজন মানুষ এর জন্যে কত অপমান সহ্য করেছে, তার জীবন পর্যন্ত যেতে বসেছিল। এখন তার শরীরে তাগৎ নাই, আর কিছুই না, সব আশা-ভরসা ওই রমণী। এখন তুমি যদি তারে কেড়ে লও, তবে তুমি আর মানুষ থাকবা না। অমানুষরাই এমন কাম করে।

কমলি তার হাত লালনের উরু পর্যন্ত তুলে বলল, ধুৎ। রাখো তো ওইসব কথা। কাশেম কিছু জানবে না। কেউ কিছু জানবে না। তুমি আমারে রক্ষা করো সাঁই।

লালন বলল, কেউ জানবে না, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা তো জানবে। তারে ঘুম পাড়াব কী করে?

কমলি বলল, কী যে তুমি কও, বুঝি না। মনের মধ্যে একটা মানুষ, অন্তরাত্মা না ছাই! আমাগো মনের মধ্যে অন্য কেউ কথা কয় না। নিজেরা যা বুঝি, তেমন কথা বলি।

লালন হেসে বলল, আমার তো নিজের বোধ-বুদ্ধি কিছু নাই। তাই অন্তরের কথার উপর নির্ভর করি। হাতটা সরাও কমলি!

কমলি এবার বেপরোয়া হয়ে গিয়ে আরও হাত বাড়িয়ে লালনের পুরুষাঙ্গটি চেপে ধরল।

সেটি উত্থিত তো বটেই, লোহার মতন কঠিন।

কমলি হি হি করে হেসে বলল, এই যে, এই যে, তোমার বাসনা আছে ষোলোআনা। তুমি ভাবের ঘরে চুরি করো।

লালন বলল, শরীর জাগে শরীরের নিয়মে। কিন্তু মন যদি না জাগে, তাইলে কি প্রকৃত মিলন হয়? শরীরে আগুন লাগে, কিন্তু বাসনার শিখা হয় একটা সোনার প্রদীপের মতন... আরেঃ, এই সব কথাই বা আমি কইলাম ক্যামনে? কী যে হয় আমার!

কমলি একটুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল।

তারপর দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরের মধ্যে সে রেখে গেল তার অশ্রুত কান্নার রেশ।

আর কি ঘুম আসে! সারারাত জেগে রইল লালন।

৯

আর কিছুদিনের মধ্যেই এই শিমুলতলার স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা পঞ্চাশ

ছাড়িয়ে গেল। এখানে গুপ্তধন পাওয়া যায়নি, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে কেউ সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার আহ্বান জানায়নি, তবু এত মানুষ চলে আসছে কীসের টানে? হয়তো কিছু গুপ্তধনই পেয়েছে, যা চোখে দেখা যায় না, যার নাম শান্তি।

খুব বুড়ো-বুড়ি কেউ আসে না, একেবারে কম-বয়সিও বিশেষ নেই, আসে শুধু সেই ধরনেরই নারী-পুরুষ, যারা কোনওরকম নিপীড়ন কিংবা অসম্মানের বাধ্যতা থেকে পালিয়ে এসে নতুন জীবন গড়তে চায়। জীবিকার জন্য এখানে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু কারুর প্রভুত্ব কিংবা ফতোয়া মানতে হয় না। ক্রীতদাস প্রথা এখন আইনত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে বটে, তবু সমাজের নিচু তলার বহু মানুষই আজও ব্যবস্থার দাস। এই অরণ্য উপনিবেশে সকলেই মুক্ত আর স্বাধীন। অন্দরমহলের অবরোধ আর নানা রকম নিষেধের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে নারীরাও এখানে দিনের আলোয় স্বচ্ছন্দ পায়ে ঘুরে বেড়ায়।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, নদী নালায় এখনও জল কমতে শুরু করেনি। অনেক গাছেই নতুন পাতা গজিয়েছে। এই সময় কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে। আকাশের মেঘে কালো রং মুছে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা সাদা ছোপ। আর জঙ্গলের মধ্যে জলাশয়গুলির ধারে ধারে ফুটে উঠছে কাশ ফুল।

এই নতুন পল্লী থেকে কিছুটা দূরেই একটা ছোট্ট নদী, তার নাম গোরাই। ছোট বটে, কিন্তু ভরা বর্ষায় তার খুব তেজ ছিল, তীর উপচে উঠেছিল জল। সেই ভোরাই নদীতে এখন অনেক মাছ, বিশেষত বড় বড় শোল মাছের দাপট খুব।

শোল মাছ বেশ তেজি আর শক্তিশালী হলেও ধরা সোজা। তারা খুব গভীর জলে থাকে না, মাঝে মধ্যেই উপরিতলে ভেসে ওঠে, পাড়ে দাঁড়িয়েও ছায়ার মতন দেখতে পাওয়া যায়। এই মাছ হয় দুঃসাহসী কিংবা নির্বোধ, মানুষ দেখলেও অদৃশ্য হয়ে যায় না। তারা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বল্লম কিংবা ল্যাজা দিয়ে গেঁথে ফেলা যায়। নতুন বসতির বাসিন্দারা অনেকে এখন এই শোল মাছ মারায় মেতে উঠেছে।

শোল ছাড়াও পোনা মাছও দেখা যাচ্ছে বেশ। এই সময় পোনা মাছ ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো ঝাঁক বেঁধে যায়, স্বচ্ছ জলে অনেক সময়ই সেই ঝাঁক চোখে পড়ে। অত ছোট্ট মাছ কেউ ধরে না, তবে ওদের মাকে আশে পাশেই দেখা যাবে বলে মৎস্য-শিকারীরা ওৎ পেতে থাকে।

লালনও দুপুরবেলা আরও কয়েক জনের সঙ্গে মাছ ধরছিল, দুদ্দু শাহ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, লালনভাই, লালনভাই, তোমারে একজন ডাকতে আসিছে। শিগ্‌গির আসো—।

লালন বিস্মিত হয়ে বলল, আমারে ডাকে? কেডা?

দুদ্দু বলল, তা তো জানি না। একজন ভদ্দরলোক, বাবুগো মতন, সঙ্গে একটা ছেলেও আছে।

লালন ভুরু কুঁচকে রেখেই আবার জিজ্ঞেস করল, কোনও ভদ্দরলোক আমারে চেনবে কেমনে? আমার নাম ধইরা ডাকছে?

দুদ্দু বলল, হ। পায়ে জুতা আছে, তাই দেইখাই তো বোঝলাম যে, কোনও বাবু টাবু হবে।

লালন বলল, খাইছে! জমিদারগো কেউ আইল নাকি? সঙ্গে প্যায়দা আছে?

দুদ্দু বলল, না, প্যায়দা নাই। শুধু দুইজন।

লালন অনুমানও করতে পারল না, বাবুশ্রেণির কে তার খোঁজ নিতে আসবে এখানে। যাই হোক, গিয়ে তো দেখতেই হবে।

একটা পোনা মাছ ধরেছে লালন, সেটা সে জুবের নামে একজনের হাতে দিয়ে বলল কমলিকে পৌঁছে দিতে। কালুয়া চলে যাবার পর লালন আর নিজের জন্য রান্না করে না। অন্য কারুর না কারুর ঘরে খায়।

একটা ভাঁজ করা লুঙ্গি পরা, সর্বাঙ্গে জল কাদা মাখা লালন শিমুল গাছ তলায় এসে দেখল, একটা শুকনো গাছের গুঁড়িতে বসে আছেন দু'জন বাবু। একজনের বয়স তেমন বেশি না হলেও মাথার চুলে একটু পাক ধরেছে, অন্যজন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ। দু'জনেই ধুতি ও পিরান পরা, পায়ে জুতো।

লালন ও দুদ্দু সেলাম দিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল।

একটু বয়স্ক মানুষটি লালনের সর্বাঙ্গে দু'বার চোখ বুলিয়ে বললেন, তুমিই লালন? তুমি আমাকে চেন?

লালন হাত জোড় করে কাঁচুমাচু ভাবে বলল, আজ্ঞে না হুজুর।

লোকটি বলল, আমার নাম শ্রীহরিনাথ মজুমদার। আর এই আমার তরুণ বন্ধু মীর মোশাররফ হোসেন। তুমি আমাকে চেন না? আমি বিখ্যাত মানুষ। কত সাহেবসুবো, জমিদার, কলকেতা-ঢাকার মানুষও আমাকে চেনে, আর তুমি আমার নাম শোনোনি?

লালন আবার একই ভাবে বলল, না হুজুর।

হরিনাথ এবার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, আমি মোটেই কেউকেটা নই, কীটস্য কীট। আমার ধনবল নাই, শিক্ষা গৌরব নাই, একখান ভদ্রস্থ ভদ্রাসনও নাই, তবু কিছু মানুষ এই নামটা জানে। কেন জানে? আমি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একখান পত্রিকার এডিটর। তুমি সে পত্রিকা পড়েছ কখনও?

লালন বলল, হুজুর, ভাইগ্য দোষে আমার ল্যাখ্যা পড়া কিচ্ছু হয় নাই। আমি পড়তে লেখতে জানি না। আমারে মাপ করবেন।

হরিনাথ বলল, হুজুর হুজুর করছ কেন? আমি কি তোমার মালিক না মুরুব্বি? আমার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞেও করতে হবে না। বললাম তো, আমি অতি সাধারণ মানুষ। আমার পত্রিকা তুমি পড়ো না, তাতে দোষের কিচ্ছু না। অনেকেই পড়ে না। কেউ কেউ পড়ে। দুই-চারজন পয়সা দিয়ে কেনে। আবার কেউ কেউ পরে দাম দেব বলে আর দেয় না। তোমরা দুইজন খাড়াইয়া রইলে কেন, বসো।

লালন আর দুদ্দু একটু দূরত্ব রেখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে। এখনও এই দু'জনের আগমনের হেতু ওরা বুঝতে পারছে না।

অল্প বয়সি ছেলেটি চুপ করে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। হরিনাথ আবার বলল, আমার কাগজের আমিই এডিটর, আমিই লেখক, রিপোর্টার, আমিই দপ্তরী, আমিই মোড়ক করি পোস্ট অফিসে দিই। আমি নিজে নিজেই এই দিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরি। কত গ্রামে কত অভাব, রাস্তা নাই, ইস্কুল-মাদ্রাসা নাই, আছে শুধু দারিদ্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কার, তার উপরে আছে জমিদারের অত্যাচার। সেই সব কথা কিছু কিছু লিখি। তুমি শুনে আশ্চর্য হোয়ো না, আমার এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় লিখলে কিছু কিছু কাজও হয়। ইংরেজ রাজত্বের অনেক দোষ থাকলেও তারা জমিদারদের বাড়াবাড়ি দেখলে দমন করে। আবার অনেক বদ ইংরেজও আছে, ইংরেজ পুলিশ, অত্যাচারী নীলকর সাহেব, তাদের কথাও লিখতে ছাড়ি না। সেইজন্যই তোমাদের এই নতুন গ্রামটা দেখতে এসেছি। তুমি এখানকার মোড়ল?

লালন বলল, আজ্ঞে না। আমি না, আমি না।

হরিনাথ জিজ্ঞেস করল, কয়েকজন যে বলল, এটা লালন সাঁই-এর গ্রাম। তুমি না, তবে কে মোড়ল?

লালন বলল, সে রকম তো কেউ নাই। আমি অন্য সকলেরই মতন একজন।

হরিনাথ বলল, হুঁ। জঙ্গলের মধ্যে যে বসত্ গড়েছ, জমিদার কি তোমাদের এই জমির পাট্টা দিয়েছে?

না তো।

খাজনা দাও?

আজ্ঞে, খাজনার কথাও জানি না।

এই যে জমি-জঙ্গল সব কিছু, তা কোন্ জমিদারের তা জানো?

না, তাও জানি না।

বাঃ বেশ! যার যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই বাড়ি-ঘর করে থাকতে পারলে তো এই পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত হে!

আপন মনে একটু হেসে হরিনাথ পাশ ফিরে বলল, মীর, জমিদারদের কথা এদের জানিয়ে দিই, কী বলো?

মীর বলল, অবশ্যই জানানো উচিত। জমিদারের পেয়াদারা এসে তো যে-কোনও সময়েই এদের উচ্ছেদ করে দিতে পারে।

হরিনাথ লালনদের বলল, শুনলে তো মীরের কথা। তোমরা কিছুই না জেনে পরম সুখে আছ। কিন্তু যে-কোনও সময়েই তোমাদের এই ভিটেমাটি চাটি হয়ে যেতে পারে। এই সুখের জীবন এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে।

লালন বলল, জমিদারের পেয়াদাদের কথা মাঝে মাঝে শুনি। কার জমিদারি তা জানি না। ভেবেছি, সবই তো পরমেশ্বরের দান।

হরিনাথ বলল, পরমেশ্বর মাথায় থাকুন। এই ধরাধামে রাজা, জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ এদের কাছেই মাথা নত করে থাকতে হয়। মূল্য না দিলে কোনও কিছুর উপরে অধিকার জন্মায় না।

মীর বলল, এ তল্লাটের জমিদার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর।

হরিনাথ জিজ্ঞেস করল, তুমি তাঁর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?

এবারেও লালন অপরাধীর মতন মুখ করে বলল, না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বর্তমান জমিদার। তাঁর নামও জানো না? তিনি তো সর্বজন পূজ্য, দেশ-বিদেশ খ্যাত মহাপুরুষ। তবে, মহাপুরুষ হলেও জমিদার হিসেবে খুব কড়া।

আমি ঠাকুরদের জমিদারির কথা জানি। কিন্তু এখন কে জমিদার আর কতখানি তাঁদের এলাকা, তা জানি না।

দেবেন্দ্র ঠাকুর যখন মহাল পরিদর্শনে আসেন, তখন সব প্রজাদের নজরানা দিতে হয়। তাঁর আমলে অনেক দরিদ্র প্রজা সর্বস্বান্ত হয়েছে। তিনি যতদিন মহর্ষি হননি, ততদিন তবু গরিব-দুঃখী প্রজারা তাঁর কাছে ধর্না দিতে পারত, তিনি কারুরে কারুকে দয়া করতেন। এখন তিনি ব্রাহ্ম সমাজের মহাগুরু, নিরাকার পরম ব্রহ্মকে নিয়েই এত ব্যস্ত যে, গরিবের কথা শোনার সময় তাঁর নেই। দুঃখী মানুষদের কান্না তাঁর কানে যায় না। তিনি আমার ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট নন। আমি তাঁর জমিদারিতে প্রজাদের অবস্থার কথা কিছু কিছু লিখেছি যে।

মীর বলল, আপনাকে অপছন্দ করার আর একটা কারণও আছে। আপনি আগে ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের পান্ডা, এখন ব্রাহ্ম ধর্ম ছেড়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চ্যালা হয়েছেন।

হরিনাথ বলল, কিছুদিন আমি ব্রাহ্ম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম ঠিকই। এখন আর আগ্রহ বোধ করি না। ব্রাহ্মদের রকম সকম আমার কেমন যেন স্বদেশীয় মনে হয় না। লালন, তুমি কোন্ ধর্ম মানো? তোমার এখানে তো হিন্দু-মুসলমান দু'রকম মানুষই আছে দেখছি। কয়েক জনের সঙ্গে কথাও বলেছি।

লালন বলল, এখানে যার যেমন খুশি ধর্ম মানে। এমনকি একজন মানুষ দুই রকম ধর্মও মানতে পারে। মানে তো দেখি। আর আমরা গান নিয়া থাকি।

হরিনাথ বলল, বাঃ, সে তো খুব অপূর্ব। তুমি নিজে কী মানো? তোমাকে অনেকেই লালন সাঁই বলে। তুমি কি জন্মগত ভাবে মুসলমান?

মীর বলল, লালন কি মুসলমানের নাম হয়? তোমার পুরা নাম কী?

লালন বলল, পুরা নাম কিছু নাই। আমি সামান্য মানুষ, ওইটুকু নামই যথেষ্ট। আমার বিদ্যা-বুদ্ধিও কম। আল্লা কিংবা পরমেশ্বরের লীলার কথা মস্তকে ধারণ করার মতন শক্তি নাই। এখনও তো মানুষরেই ভাল করে চিনলাম না। মানুষ কত বিচিত্র। আমি তো নিজেরেই এখনও জানি না। আমি কোথা থেকে এসেছি, কোন অরূপের ধাঁধায় ঘুরতেছি, তাও তো বুঝি না।

হরিনাথ বলল, আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জানো। এ তো বহু বহুকালের তত্ত্ব।

মীর বলল, সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই।

লালন বলল, এসব তত্ত্বও আমি বুঝি না। গোস্তাকি মাফ করবেন, একটা কথা কবো? আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কথা দিয়া অনেক কিছুই বুঝাইতে পারি না। তখন এক একটা গান মনে আসে। একটা গান শুনাতে পারি?

হরিনাথ বললেন, গান? বেলা বেড়েছে, আমাদের এবার যেতে হবে। ঠিক আছে, একটা গান গাও, তার বেশি না।

লালন একটুও চিন্তা না করে গান ধরল:

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন ভাবে—জাতির কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে।

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে?

যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
শরীর তবে কী হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে?

জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা তথা
লালন সে জাতের ফাতা
ঘুচায়েছে সাত বাজারে।

গান শেষ হতে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল হরিনাথ। তারপর সে বিহ্বল ভাবে বলল, এ কী গান শুনালে সাঁই! চণ্ডীদাসের মতন কোনও পদকর্তাই তো এমন সহজ-সরল ভাবে আমাদের ঘরের কথা শোনাতে পারেন নাই। তাই না মীর? এর যে অলৌকিক শক্তি আছে মনে হয়।

মীর এতটা মুগ্ধ হয়নি মনে হয়। সে শুধু বলল, হুঁ।

হরিনাথ আবার উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, আরও অনেক গান শুনতে ইচ্ছে করছে, আর যেতে ইচ্ছে করছে না।

মীর বলল, কিন্তু যেতে হবে। মজুমদার সাহেব, আর বেশি দেরি করা যাবে না।

হরিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো। লালন, তুমি আজ থেকে আমার দোস্ত হলে। আমি তোমার এখানে আবার আসব। তুমিও যেও এই দরিদ্রের কুটিরে। আরও অনেক গান শুনে ধন্য হব।

লালনকে পাশে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হরিনাথ বলল, শোনো লালন মিঞা, এই নতুন বসতিতে তোমরা সুখেশান্তিতে, গান-টান নিয়ে আছ বেশ কথা। কিন্তু জান তো, এ দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। এর পর যখন রটে যাবে যে, এই গ্রামের মানুষ শুধু নাচে আর গায়, কোনও অস্ত্র ধরতে পারে না ন্যাড়া-নেড়িদের মতন, তখন দেখবে নানা দিক থেকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে। তুমি হিংসা করবে না, কিন্তু হিংসাকে আটকাবার জন্য শক্তিরও দরকার। আর তুমি শুধু এই গ্রামে আবদ্ধ থেকো না, বাইরে বেরোও। সাঁই, তুমি এসো এই অধমের গরিবখানায়।

হরিনাথের কথাগুলি মনে ধরেছে লালনের। সে গ্রামের সমর্থ পুরুষদের নিয়ে লাঠি খেলার চর্চা শুরু করে দিল। কাশেম যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক পাশে এসে বসে থাকে, তখন লালনের বড় মায়া লাগে। কাশেমেরও নিশ্চয়ই লাঠি ধরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই।

কাশেম আর কমলি পরস্পরকে চেয়েছিল। মাঝখান থেকে জাত ও ধর্ম এসে সাংঘাতিক বাধা দিল। তাতে এই দু'টি জীবন প্রায় নষ্ট হতে বসেছে, কিন্তু জাত ও ধর্মের কী লাভ হল? মানুষকে কষ্ট দিয়ে ধর্ম? কে জানে!

লাঠি খেলা ছাড়াও আরও একটা খেলা শেখাল শীতল নামে একজন নতুন আবাসিক। রণ-পায়ে চড়া। লম্বা লম্বা বাঁশের তৈরি রণ-পায়ে উঠে ভারসাম্য রাখা সহজ নয়, প্রথম প্রথম ধপাস ধপাস করে পড়ে যেতে হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে শিখতে লাগে। লালন এতে বেশ উৎসাহ পেয়ে গেল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে শিখে গেল বেশ ভালভাবে।

এই রণ-পায়ে চেপে দ্রুত অনেক দূর যাতায়াত করা যায়। জল-কাদার বাধাও অতিক্রম্য।

এখন লালন পাঁচ-ছ'জন সঙ্গীকে নিয়ে রণ-পায়ে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ভ্রমণ করতে যায় প্রায়ই। এমনকী জঙ্গলের বাইরে হাটে যাওয়ারও সুবিধে হয়। তবে হাটের ঢোকার আগে রণ-পাগুলি রেখে যায় জঙ্গলের মধ্যে।

একসঙ্গে এত মানুষের বসতি হয়েছে বলে জঙ্গলের হিংস্র জানোয়াররা

আর এদিকে বিশেষ আসে না, শিয়াল ছাড়া। শিয়াল মানুষের গ্রামের আশেপাশেই ঘুর ঘুর করে। নিজেরা ভাল শিকার করতে পারে না, তাই চুরি করাতেই তারা দক্ষ। ফাঁক পেলেই মুখে তুলে নিয়ে যায় হাঁস-মুরগি।

জঙ্গলের মধ্যে রণ-পায়ে ঘোরার সময় কয়েকবার বাঘ ডাকা শুনেছে আর ভাল্লুক দেখেছে লালনের দলবল। এমনকী কালীগঙ্গা নদীর ধারে একদিন একটা বাঘও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এত লম্বা লম্বা মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা নেই সেইসব হিংস্র জানোয়ারদের। তারা ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দৌড়য়। বাঘটাও ঝাঁপ দিয়েছিল নদীর জলে।

ওই কালীগঙ্গা নদীর ধারেই একদিন একটা মজার ব্যাপার হল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা আর মজার রইল না।

সেদিন বিকেল শেষ হতে না হতেই অন্ধকার হয়ে এল আকাশ। অসময়ের মেঘ গুরু গুরু গর্জন শুরু করল। লালন আর তার দলবল বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল, ফেরার পথ ধরার আগেই নামল বৃষ্টি।

ঝড়-বৃষ্টিতে তেমন ভয় নেই, কিন্তু বজ্র পতনের বাড়াবাড়ি হলে বিপদ আছে। বাজ পড়েও কিছু কিছু মানুষ মারা যায়। গাছতলা কিংবা খোলা জায়গায় দাঁড়ানোও নিরাপদ নয়।

তখন ওদের মনে পড়ল, নদীর ধারে একটা শ্মশানে একটা প্রাচীন কালী মন্দির আর তার সামনে কটা ছাউনিও আছে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়।

সেই শ্মশানে এসময় একটি মাত্র শবযাত্রী দল উপস্থিত। চিতা সাজানোও হয়ে গেছে। বৃষ্টির জন্য আগুন ধরানো হয়নি। জনা পাঁচেক শবযাত্রী গুটিসুটি মেরে বসে আছে সেই ছাউনিতে।

এমন সময় তারা দেখল বিরাট লম্বা লম্বা একদল ভূত ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। অনেক গপ্পো-উপকথায় ভূতেদের এরকম দীর্ঘ শরীরের বর্ণনা থাকে।

ওরে বাপরে, মারে বলে ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে শবযাত্রীরা দৌড় লাগাল। পড়ে রইল তাদের মড়া, কেউ জলে ঝাঁপ দিল কেউ অদৃশ্য হয়ে গেল তীরবেগে ছুটে।

এই কাণ্ড দেখে লালন ও তার সঙ্গীরা হো-হো করে হাসতে লাগল। সেই হাস্যধ্বনি পলায়নপর শবযাত্রীরা শুনে আরও মনে করল ভৌতিক ব্যাপার। এমনকী, ও মশায়রা যাবেন না, যাবেন না, ভয় নাই, ফিরা আসেন, এই আহ্বান শুনে আরও ভয় বেড়ে গেল তাদের।

লালনদের হাসি আর থামে না। রণ-পা থেকে নেমে তারা বসল সেই চালার নিচে। সেখানে অনেকগুলি সরায় রাখা রয়েছে কলা ও কিছু অন্য ফল, আতপ চাল, জবা ফুল। এসব কীসের জন্য? ওরা কি কালী মন্দিরে পুজো দেবার কথাও ভেবেছিল? কিন্তু এই পরিত্যক্ত মন্দিরে তো অনেকদিন পুজো হয় না, ঠাকুরের বিগ্রহও নেই। তা হলে?

এই শবযাত্রীরা আজ রাত্রে আর ফিরবে না, তা বোঝাই যায়। শীতল বলল, এই ফলমুলগুলা আমরাই খাই না কেন?

এতে কারওরই আপত্তির কোনও কারণ নেই। ওরা খেতে শুরু করল, ক্ষণেক পরে শুনতে পেল গোঙানির শব্দ।

এবার এদের ভয় পাবার পালা। মড়াটা কি জেগে উঠল নাকি প্রেত হয়ে? শঙ্কিত ভাবে তাকাল এ ওর মুখের দিকে।

তবে, ওপরতলার মানুষ অপ্রাকৃত ব্যাপারে যত ভয় পায়, নিচের তলার মানুষ তত ডরায় না। ভূত-প্রেত নিয়েই তাদের বেঁচে থাকতে হয়।

কেউই দৌড় মারল না। লালন, শীতল আর মোয়াজ্জেম একসঙ্গে উঠে এসে মৃতদেহের ওপর ঢাকা দেওয়া চাদরটা সরিয়ে দিল এক টানে।

তারপরই তারা তাজ্জব। দেহ একটা নয় দুটো। একসঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তলারটি একজন পুরুষের, পাকা চুল-দাড়ি সমেত বৃদ্ধ, আর ওপরেরটি এক তরুণী নারীর। গোঙানি আসছে ওই নারীর কণ্ঠ থেকেই।

বেশ কয়েক মুহূর্ত এরা হতবাক হয়ে বসে রইল। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হল না মোটেই। পলাতক লোকগুলি সতীদাহ করতে চেয়েছিল। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে তার এক স্ত্রীকে সতী নাম দিয়ে পুড়িয়ে মারা বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছে ইংরেজ সরকার। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জে সে ব্যাপার এখনও গোপনে ঘটে। বিধবা যাতে গলগ্রহ হয়ে না থাকে কিংবা তাকে সম্পত্তি দিতে না হয়, তার জন্য পুড়িয়ে আপদ চুকিয়ে দেওয়াই সুবিধেজনক।

লালন ও অন্য দু'জন চটপট বাঁধন খুলে দিল। বৃদ্ধটি সন্দেহাতীত ভাবে মৃত, আর রমণীটির নাড়ি বেশ সচল। তার চেতনা নেই পুরোপুরি। সাধারণত এই রকম অবস্থায় নারীদের আফিং খাইয়ে রাখা হয়, যাতে চিৎকার-টিৎকার না করতে পারে। আর সেইজন্যই পুজোর আয়োজন। কোনওরকমে নমো নমো করে একটু পুজোর ভান করলেই মানুষ পুড়িয়ে মারার মতন নৃশংস কাজের ওপরেও পুণ্যের ছোঁওয়া লেগে যায়।

নদী থেকে সরা ভর্তি করে বার বার জল এনে ছিটিয়ে দেওয়া হতে লাগল নারীটির চোখে মুখে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে চোখ মেলে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল, তা বোঝা গেল না।

এর মধ্যে বৃষ্টি ধরে গেছে। এবার ঘরে ফিরলেই হয়। কিন্তু এই রমণীকে কী করা যাবে? আর ওই বৃদ্ধের লাশেরই বা কী ব্যবস্থা হবে? চিতা যদিও সাজানো রয়েছে। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে কাঠ একেবারে জবজবে ভিজে, ভিতরে জলও জমে আছে। সারা রাতেও আগুন জ্বালানো সম্ভব হবে না। আর লাশটি এখানে ফেলে রেখে গেলে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। এর মধ্যে শিয়ালের উপস্থিতি কাছাকাছি টের পাওয়া যাচ্ছে।

আর অর্ধ-অচেতন জীবন্ত নারীটি?

শিয়ালের দল তাকেও ছাড়বে না।

আর যদি বা সে আত্মরক্ষা করে কোনওক্রমে বেঁচে থাকতেও পারে, তাহলে কাল দিনেরবেলা পলাতক শ্মশানবন্ধুরা ফিরে এসে তাকে প্রথমেই বাঁশ পিটিয়ে মেরে ফেলবে, তারপর পচা-গলা লাশটির সঙ্গেই আবার চিতায় চাপাবে।

শীতল আর ভোরাই বাল্যকালে এরকমই দেখছে। সতী হবার জন্য কোনও নারীকে একবার শ্মশানে নিয়ে এলে আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রথা নেই। চিতার আগুন গায়ে লাগার পর কেউ যদি সহ্য করতে না পারে, যদি লাফিয়ে নেমে আসতে চায়, তখন তাকে তিন-চারজনে মিলে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে আগুনের মধ্যেই চেপে ধরে থাকে। আর দু'একজন খুব করে কাঁসর-ঘণ্টা বাজায়, যাতে তার কান্না ও আর্তনাদ শুনতে না পাওয়া যায়। অর্থাৎ মৃত্যু এর অবধারিত।

শীতল, মনসুর, ভোরাইদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ এই বিষয়ে আলোচনা করল লালন। সহজে একমত হওয়া যাচ্ছে না। মৃতদেহটিকে না হয় নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু রমণীটিকে কি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে? সে যদি নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চায়? সন্তান থাকলে তার টানে সেরকম চাইতেই পারে। কিন্তু একবার এতগুলি পুরুষের সঙ্গে কোথাও রাত্রি কাটালে তার গ্রামে ফিরে যাবার সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, তাই-বা কী করে সম্ভব? সবাই এসেছে রণ-পায়ে, এ রমণী হাঁটতে পারবে না, আর কারুর পক্ষে ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।

সুতরাং ওকে নিয়তির হাতে ছেড়ে চলে যাওয়াই তিন-চারজনের মত হল।

লালন বিশেষ তর্ক করেনি। সকলের সিদ্ধান্ত শোনার পর সে বলল, তা হলে তোমরা আর দেরি কইরো না। আগাইয়া পড়ো।

শীতল বলল, সে কি? আর তুমি?

লালন বলল, আমি একটু বসি। অর জ্ঞান ফেরলে জিজ্ঞাসা করব, ও কোথায় যাইতে চায়।

মনসুর বলল, সে কি, তুমি একা একা এইহানে বইয়া থাকবা?

লালন বলল, বসি!

রমণীটি উঠে বসে বিড়বিড় করে কিছু বলতে লাগল। তারপর কিছুটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল; এইডা কোথায়? আমি কি স্বর্গে আইছি?

দু'জন হেসে উঠতেই তাদের ধমক দিল মনসুর।

রমণীটি আবার উতলা হয়ে বলল, কও না, এইডা কি স্বর্গ?

মনসুর তাকে বলল, না দিদি, এইডা স্বর্গ না। এইডা শ্মশান।

উঠে এসে লালনকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, তুমিই ধন্য, ধন্য ফকির, তোমার সত্য উপলব্ধি হয়েছে, নইলে এমন গান রচনা সম্ভব নয়। আমরা এখনও রয়ে গেলাম বিষয়ে আবদ্ধ জীব।

একদিন একটা অন্যরকম ঘটনা ঘটল।

সেদিনও লালন তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে হরিনাথের বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে বসে অন্যদের কথা শুনছে। হরিনাথ এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছে জমিদারদের বিরুদ্ধে। এমন সময় এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে এসে হরিনাথের কানের কাছে কী যেন বলল।

একটুক্ষণ শোনার পর হরিনাথ উত্তেজিতভাবে বলল, তাই নাকি? চলো, সবাই যাই।

উঠে দাঁড়িয়ে সে লালনকে বলল, চলো বন্ধু, তুমিও চলো।

লালন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?

হরিনাথ বলল, নদীর ধারে। বেশি সময় নেই, চলো, যেতে যেতে তোমায় সব বলব।

ঘটনাটি এই—কুমারখালির মানুষের নানারকম অভাব-অভিযোগ রয়েছে। ইস্কুল-মাদ্রাসা মাঝে মাঝেই বন্ধ হয়ে যায়। রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই। বন্যায় গোরাই নদীর পাড় ভাঙছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার তো লেগেই আছে। কিন্তু জমিদারের নায়েব এর কোনও প্রতিকার করে না, পুলিশ এসব অভিযোগে কান দেয় না। সর্বত্র অরাজকতা। একমাত্র জেলার হাকিমের কাছে সব কিছু জানালে কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু হাকিম সাহেবের কাছে তো পৌঁছনই যায় না।

খবর আছে, আজই হাকিমসাহেব তার লঞ্চ নামে কলের জাহাজে এই গোরাই নদী দিয়ে যাবেন। তখন সাহেবের কাছে অনেকে মিলে গিয়ে অভাব-অভিযোগের কথা জানাবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।

প্রায় হাজারখানেক মানুষ সমবেত হয়েছে গোরাই নদীর তীরে। হরিনাথের সঙ্গে লালনের দলবলও সেখানে এসে দাঁড়াল।

সত্যিই সে স্টিমার আসবে তো? নাকি সবটাই গুজব? এরকম গুজব আগেও রটেছে। কুমারখালির মতন এক ক্ষুদ্র শহরে সাহেব আসবেন কেন? সবাই অধীর প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে নদীর পূর্ব দিকে।

নদীতে নৌকোর অভাব নেই। কয়েকজন সেই সব নৌকোর মাঝিদের জিজ্ঞেস করল, কলের জাহাজের সংবাদ। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না।

একসময় দূরে দেখা গেল ধোঁয়া আর কলের জাহাজের ভোঁ। তাহলে আসছে, আসছে! জনতার হর্ষধ্বনি ছুঁয়ে গেল দিগন্ত।

একসময় ভোঁ দিতে দিতে জাহাজটি এসে গেল কাছে। কিন্তু এ কী, জাহাজের তো কুমারখালিতে থামার কোনও লক্ষণ নেই। জেটি ঘাটে কর্মচারিরা তৈরি হয়ে আছে, অথচ মাঝনদীতে জাহাজের মুখ সামনের দিকে।

জনতা চিৎকার করতে লাগল। তা আকুল আহ্বান হলেও জাহাজ কর্ণপাত করবে না, ভোঁ দিয়ে দিয়ে নৌকোগুলিকে সরে যাবার নির্দেশ জানানো হচ্ছে জাহাজ থেকে।

হরিনাথ হতাশভাবে বলল, যাঃ! কোনও আশা নাই! এই সব সাহেব-সুবোর সামনে পৌঁছনই এক ঝক্কি-ঝামেলা। যদি কোনওক্রমে মহামান্য হাকিমের কাছে আমাদের কথাগুলি পৌঁছে দেওয়া যেত!

লালন বলল, হাকিমের এই কলের জাহাজ থামানো যায় না?

হরিনাথ বলল, কী করে থামাবে? কোনও নৌকো নিয়ে কাছে এগুতে গেলেও গুলি করতে পারে।

লালন বলল, অন্য উপায়ও আছে। এই যে এত মানুষ, আমরা সবাই মিলে যদি নদীতে নেমে পড়ি, তাহলে আমাদের ওপর দিয়েও কি কলের জাহাজ চালাতে পারবে? আপনি অন্যদের বলে দ্যান, আমরা জলে নামতেছি।

লালন তার সঙ্গীদের নিয়ে ঝাঁপ দিল নদীতে। সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু মানুষ, প্রায় হাজারখানেক তো হবেই, তাদের অনুসরণ করল। নদী ভরে গেল মানুষে। হাজারখানেক মানুষ সাঁতার দিয়ে ঘিরে ফেলল সেই কলের জাহাজ।

হাকিমসাহেব সহৃদয়। তিনি এত মানুষ দেখে গুলি চালাতে বললেন না, বরং সকৌতুকে ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন। হরিনাথ ও আরও তিনজন জনপ্রতিনিধি সাহেবের আহ্বানে উঠে গেল জাহাজের ওপরে।

সাহেব ধৈর্য ধরে সব কথা শুনলেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের প্রতিকারেরও আশ্বাস দিলেন তিনি।

কুমারখালির উন্নতি বা অন্য কিছুর অংশীদার নয় লালন। সে নেতাও হতে চায় না।

তবু রটে গেল যে, জঙ্গলের মধ্যে দলবল নিয়ে থাকে লালন নামে এক ফকির, সে-ই হাকিমসাহেবের জাহাজ থামিয়ে দিয়েছে।

লালন যতই বলে, না, না, ও সব কিছু না। আমরা সাঁতার জানি বলে আগে পানিতে নেমেছি, কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করে না।

১১

স্ত্রীলোকটির নাম, সে নিজেই জানাল, ভানুমতী ঠাকুরানী। লোকের মুখে মুখে অচিরেই তা হয়ে গেল ভানতি ঠাইরেন, আরও সংক্ষেপে শুধু ঠাইরেন। বয়স তিরিশের নিচেই, গৌরাঙ্গী, চেহারা একটু ভারীর দিকে, ঘন চুল চালের মতন ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর।

এক কায়স্থ ব্যবসায়ীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, বড় সতীন এখনও জীবিত, তার তিনটি বড় বড় সন্তান আছে। এর এখনও কোনও সন্তান হয়নি, সেই জন্য সতী হবার জন্য একে নির্বাচন করা হয়েছিল। ভানুমতিকে ধরাধাম থেকে বিদায় দেবার জন্য স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য বোঝাই যায়।

প্রথম দু'দিন অনেকটা ঘোরের মধ্যে থাকলেও তারপর স্বাভাবিক হবার পর দেখা গেল, তার বেঁচে থাকার ইচ্ছে ষোলো আনা। তার স্বভাবেও চাঞ্চল্য আছে, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না, নিজেই এখানকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে ভাব করে নিল।

প্রথমে তাকে কমলির জিম্মায় রাখা হয়েছিল। কমলি তার যত্নের ত্রুটি করেনি, সেবা-শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তুলেছে।

তারপরই সে ভানুমতীকে জিজ্ঞেস করল, দ্যাখছো তো বইনডি, এই যে আমাগো গেরাম, এইডাই আমাগো স্বর্গ। এখানে হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে থাকে। তোমার আবার ছোঁয়াছানির বাতিক নাই তো? আমি তোমার জাইত মারতে চাই না।

ভানুমতী জিজ্ঞেস করল, তুমি কী?

কমলি বলল, আমি আগে আছিলাম বাম্‌নি। এখন আমার খসম মোছলমান।

তারপরই হাসতে হাসতে বলল, এই কথাডা যেন লালন সাঁইরে পুছিয়ো না। তাইলেই সে গান গাইয়া শোনাবে, সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে! এখানে কেউ কেউ আছে, হিন্দুও না মোছলমানও না। কিংবা দুই-ই।

হতভম্বের মতন মুখ করে ভানুমতী বলল, তা আবার হয় নাকি?

কমলি বলল, হয়। নিজের চক্ষেই দেখতে পাবা। কেউ পুজো করে, কেউ নামাজ পড়ে, কেউ কিছুই করে না। কোনও তকল্লুফ নাই। তুমি কী করতে চাও, এখানে থাকবা না ফিরা যাইতে চাও?

ভানুমতী বলল, কোথায় যাব?

কমলি বলল, এর উত্তর আমি কী করে দিমু? নারীজাতি একবার যদি ঘর ছাড়ে, তার আর ঘর থাকে না। তোমার বাপেরবাড়িতে কেউ আছে?

ভানুমতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নাই!

কমলি বলল, জানা কথা। বিয়ার পরেও বাপেরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, এমন ভাগ্যবতী আর কয়জন হয়! এখানেই থাকো। কিছু কাম-কাজ করো। নিজেরটা নিজে বুইঝ্যা নিতে হবে। দিনের পর দিন কেউ তোমারে খাওয়াবে না।

ভানুমতী বলল, আমি কী কাজ করব?

কমলি বলল, কাম তো অনেকই আছে। এখন তুমি আমার ঘর থিকা একটা ধামা লইয়া যাও। এই জঙ্গলে অনেক জামগাছ আছে। এই সময় জামে জামে গাছ একেবারে ভইরা থাকে। কাউয়ায় খায়, বান্দরে খায়, গাছতলায়ও পইড়া থাকে অনেক। টোবা টোবা দেইখ্যা ধামা ভইরা কুড়াইয়া আনো। এই জাম লবণ আর একটু কাসুন্দি দিয়া মাখলে খুব ভাল

টাকনা হয়, এক থাল ভাত খাওন যায়।

ভানুমতী চলে গেল জাম কুড়োতে।

কয়েকদিন পর এক দুপুরে নিরিবিলি পেয়ে কমলি এল লালনের কাছে।

দুপুরে এক পেট খাওয়ার পর লালন একটা গাছতলায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে মৃদু স্বরে একটা গান গাইছে।

এখন লালনের কণ্ঠে ঘন ঘন গান আসে। সেই সব গান তার ঘনিষ্ঠ মানুষেরা শোনে, তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। লিখে রাখার কোনও প্রশ্ন নেই। এখানে লেখা-পড়ার কোনও বালাই নেই, কেউই ওসব জানে না, লালন তার গানগুলি স্থায়ী করে রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না।

কিন্তু অন্যরা তার কিছু কিছু গান আবার শুনতে চায়। লালনের নিজেরই দু'এক চরণ ছাড়া মনে থাকে না সব। সে তখন হাসে।

এখন গানগুলি ধরে রাখার একটা উপায় পাওয়া গেছে। সে গান শুরু করলেই কয়েকজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে গনাই কোথায় গেল, ডাক ডাক তাকে।

গনাই শেখের ছোট্টখাট্টো চেহারা, প্রায় বামনই বলা যায়। সে প্রায়ই জ্বরে ভোগে, কাজ-কম্ম বিশেষ পারে না। কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। গলাতেও বেশ সুর আছে। লালনের গান একবার শুনেই সে কণ্ঠে ধরে রাখতে পারে। পরে আবার গেয়ে শোনায়।

লালনের কখন যে গান মনে আসবে তার তো ঠিক নেই। হয়তো পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলছে নানা বিষয়ে, কিংবা নিজের কাজ করছে, হঠাৎ মিনমিন করে গান আসে। নদীতে পোনামাছের বাচ্চাদের ঝাঁক যেমন দেখা যায়, সেইরকমই যেন গানের কথাগুলি আসে ঝাঁক বেঁধে, তাতে নতুন নতুন সুরও লেগে যায়।

তাই মনে গান এসে গেলে সে আগে বলে ওঠে, ওরে, আমার মনের মইধ্যে পুনামাছের ঝাঁক আইছে। আইয়া পড়ল।

অন্যরা অমনি বুঝতে পারে, তখনই গনাইয়ের নাম ধরে হাঁকডাঁক শুরু হয়ে যায়। দেরি হলে কেউ তার ঘেঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে।

গনাই রামভক্ত হনুমানের মতন লালনের খুব কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। যেন সে লালনের ঠোঁট নাড়া ছাড়া আর কিছুই দেখে না, লালনের কণ্ঠস্বর ছাড়া অন্য কোনও শব্দ তার কানে যায় না। এক একবার হয়তো সে লালনকে দুই এক চরণ আবার গাইতে অনুরোধ করে, লালনের গান শেষ হলে সে পুরো গানটি নির্ভুল শুনিয়ে দেয়।

গনাই শেখ আগে ছিল কৌতুকের পাত্র। এই গুণের জন্য এখন তাকে সবাই বেশ খাতির করে।

লালন গান গাইছে দেখে কমলি বলল, নতুন গান? গনাইকে ডাকি?

লালন বলল, না, দরকার নাই। মোটে দুই-তিনটা চরণ, তারপর অস্পষ্ট, নিজেই বুঝতেছি না। এ গান এখন পুরা হবে না।

কমলি পাশে বসে পড়ে বলল, সাঁই, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

লালন বলল, কও।

কমলি বলল, আমারে তো ফিরাইছিলা। এবার তুমি কী করবা?

লালন বলল, বুঝলাম না। কিসের কী?

কমলি বলল, নতুন যে মাইয়াডা আইছে, সে এখন থাকবে কোথায়? আমরা কয়দিন ওরে রাখব? আর কার বাসায়... সে তো কোকিল না যে, কাউয়ার বাসায়...

লালন বলল, ঠিক, অর জইন্য একটা ঘর বানাইতে হবে। কালুয়া থাকলে কত সুবিধা হইত।

কমলি বলল, কালুয়ার কথা ছাড়ান দাও। সে আর ফিরা আসবে না আমি জানি। এখানে আর সক্কলডিই দোকা দোকা, তুমিই শুধু একা। অনেকেই বলাবলি করতেছে, তোমার ঘরেই ওরে রাখা উচিত।

লালন সহজভাবে বলল, তা থাকতে পারে।

কমলি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, তারপর?

লালন বলল, তারপর কী?

কমলি বলল, সাঁই, তুমি কি কিছুই বোঝো না? নাকি বুইঝাও না বুঝার ভান করো। রাইতের বেলা ও মাইয়ার বুকে যদি আগুন জ্বলে, তুমি নিবাবা না? আমার আগুন এখনও জ্বলতেছে, তুমি গেরাহ্য করো নাই।

লালন বলল, শুধু আগুনের কথা কও কমলি, নদীর কথা কেন কও না?

কমলি বলল, কথা ঘুরাইও না, কথা ঘুরাইও না। আমি নদীর কথা জানি না। আগুনের কথা জানি। মাইয়ামানুষরে সারা জীবন যে কতরকম আগুনে দগ্ধ হইতে হয়, তা তোমরা কি বুঝবা!

লালন বলল, আমি নিজেরেই এখনও বুঝি না, মাইয়ামানুষের কথা কী করে বুঝব। সব সময়েই মনে হয়, একজন কেউ আমারে দেখে, কিন্তু আমি তারে দেখি না। এ যেন এক আরশির নগর। সব কিছুই ঝলমল করে, শুধু পড়শিরে দেখা যায় না।

কমলি বলল, আমার আগুনে আমি দুইজন পুরুষরে পুড়াইছি। জানি, একদিন নিজেই খাক হয়ে যাব। সাঁই, তুমি আমারে কিছু দাও নাই, তবু আমি তোমারে একখান উপহার দেব। আমি নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া এই নতুন মাইয়াডারে পৌঁছাইয়া দেব তোমার ঘরে।

সত্যিই তাই হল, সেই রাতের বেলাতেই ভানুমতীকে লালনের ঘরে নিয়ে এল কমলি। ভানুমতীর কাল নরুণ পাড় শাড়িখানা ধপধপে সাদা। পান খেয়ে সে ঠোঁট লাল করেছে। কমলির নিজের মাথায় চুল নেই, তাই মনের সাধ মিটিয়ে সে ভানুমতীর চুল আঁচড়িয়ে বেঁধে দিয়েছে খোঁপা।

কমলি হেসে বলল, এই নাও সাঁই, তোমার উপহার!

লালনের সঙ্গে তেমন ভাব হয়নি ভানুমতীর। তাকে মনে হয়েছে দূরের মানুষ। দূর থেকেই দেখেছে লালনকে, তার গানও শুনেছে। কথা বলা হয়নি। সে দরজার কাছে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে ছোট্ট ঠেলা মেরে কমলি বলল, আরে ভান্‌তি ভিতরে যা। আজ থিকা এইটাই তোর ঘর। ভয় নাই। এই মানুষটা তরে খাইয়া ফেলাবে না।

গলা তুলে সে আবার বলল, দেইখ্যো সাঁই, ভান্‌তিরে যেন ভ্রান্তি না হয়।

তারপর সে সরে গেল সেখান থেকে।

এখন আর মাটিতে শুতে হয় না, চাটাই জোগাড় হয়েছে, বালিশও আছে। দ্বিতীয় চাটাইটি গোটানো আছে এক পাশে, সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে লালন বলল, ওইটা পেতে লও। তারপর শুয়ে পড়।

মাদুরটা পাততে গিয়ে ভান্‌তি জিজ্ঞেস করল, পুব দিক কোনটা?

লালন বলল, পুব দিক! কেন, তা জেনে কী হবে।

ভান্‌তি বলল, পুব দিকে পা দিয়া শুইতে নাই।

লালন বলল, তাই নাকি! পুব দিক, পুব দিক, এই ঘরের পিছনের দিকে প্রভাতের সূর্য ওঠে। আরে, আমি তো অ্যাদ্দিন সেইদিকেই পা দিয়া শুইছি।

লালন উঠে নিজের চাটাইটা ঘুরিয়ে নিল। তারপর বলল, একসময় আমার এক দোস্ত এই ঘরে থাকত। আমি নাকি ঘুমের মইধ্যে কথা কই মাঝে মাঝে, গানও গাইয়া উঠি, আমি নিজে তা টের পাই না। তেমন যদি হয়, তুমি ভয় পাইয়ো না।

ব্যস, সে রাতে সেইটুকুই কথা হল।

লালনের ঘুম ভাঙে খুব ভোরে।

এই সময় পাখিরা নিজেদের মধ্যে সম্ভাষণ শুরু করে দেয়। পাতলা জালের আবরণের মতন আস্তে আস্তে গুটিয়ে যায় অন্ধকার। স্নিগ্ধ বাতাসে গাছের পাতারাও যেন কথা বলাবলি করে। জীব জগৎ ছাড়া বস্তু জগতেরও বুঝি ভাষা আছে নিজস্ব।

লালন হাঁটিতে হাঁটিতে নদীর ধারে চলে আসে। কোনও কোনওদিন তারও আগে পৌঁছে যায় শীতল আর মনসুররা কেউ কেউ। মনসুরের বউ নাজমাও থাকে সঙ্গে। নদীর জলে ওরা যে আঁটন দিয়ে রাখে সেখানে মাছ পড়েছে কিনা তা দেখার কৌতূহলই টেনে আনে ওদের।

রোজই কম-বেশি মাছ পড়ে। খলসে, পাবদা, বেলে, চ্যাং। ইচা মাছ। দু'একটা সাপও আটকে যায়, সেগুলি অবশ্য জল ঢোঁড়া। যেদিন মাছের পরিমাণ খুব বেশি হয়, সেদিন ওদের দু'জন সেই মাছ নিয়ে বাজারে ছুটে যায়। মাত্র ক্রোশ দু'একের পথ। এখন এ অসমের তাঁতি ও কারিগরদের হাতে বেশ পয়সা, তারা নিজেরা মাছ ধরার সময় পায় না, বাজারের মাছ

কেনে।

এরপর লালন যায় তার পানের বরজের যত্ন নিতে।

শিমুলতলায় গ্রামটির জীবনযাত্রায় একটা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ এসে গেছে। যে যার মতন আনন্দে আছে। উৎকট দারিদ্র নেই এখানে, সকলেরই কিছু না কিছু খাদ্য জুটে যায়। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু সেবা পাওয়া যায়। বিশেষত মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে-কোনও অসুস্থ মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে আসে। তারপর শেকড়-বাকড় আর জড়িবুটির ওপর ভরসা।

এ পর্যন্ত এই বসতির একজনই পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। এখানে আসার আগে থেকেই তার শ্বাস-কষ্টের ব্যাধি ছিল। কখনও দিনের পর দিন ঠিক থাকত, আবার বেড়ে যেত সহসা। বাড়াবাড়ি হলেই শয্যাশায়ী। দু'-তিনবারই মনে হয়েছে, সে বুঝি আর বাঁচবে না। কিন্তু কয়েকদিন পরই আবার চাঙ্গা হয়ে লেগে যেত কাজকর্মে। সে দিব্যি বেয়ে উঠতে পারত তালগাছ, তালের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো ছিল তার পেশা। একদিন সে যখন তালগাছের ডগায় উঠে রসের হাঁড়ি নামাচ্ছিল, সেই সময় অকস্মাৎ তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কাশির দমক সামলাতে না পেরে সে হাঁড়িসমেত পড়ে যায় নিচে। তাতে তার হাড়-গোড় বিশেষ ভাঙেনি বোধহয়, কারণ নিচে ছিল নরম কাদামাটি, কিন্তু তার বাক্‌রোধ হয়ে যায়।

এর পরও সে বেঁচে ছিল তিনদিন। মনিরুদ্দি নামে সেই মানুষটির স্ত্রী মানোয়ারাও কমজোরি, কিন্তু তাকে বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। অন্তত দশজন নারী দিবারাত্র পালা করে তার সেবা করেছে। এমন সেবা কি সে আর কোথাও পেত? একেবারে অন্তিম দশায় মনিরুদ্দির চক্ষু দিয়ে অনবরত পানি ঝরতে থাকে, কিন্তু তার ওষ্ঠে লেগে থাকে হাসি। অর্থাৎ তার এই অশ্রু কষ্টের নয়, আনন্দের। চোখের ইঙ্গিতে মানোয়ারাকে কাছে ডেকে সে শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

তার এই মৃত্যু এখানে কারুর কাছেই তেমন শোকের মনে হয়নি। এই যেন খুব স্বাভাবিক পরিণতি। যেতে তো হবেই সকলকে, শেষের কয়েকটা দিন তবু সে সুখেই কাটিয়েছে। সে জেনে গেছে যে, তার অবর্তমানে তার বিবি বিপদে পড়বে না। অন্যান্য গ্রামে পতিহারা নারীদের কত মানুষ কষ্ট দেয়। এই নয়াপত্তনে সবাই সবাইকে দেখে।

মনিরুদ্দি আগেই বলে গিয়েছিল, তাকে গোর দিতে হবে না, তার জানাজা হবে না। তার দেহটাকে নদীতে ভাসিয়ে দিলেই সে চিরশান্তি পাবে।

এখন আবার যাদুমনি জ্বরে পড়েছে। এই সব অঞ্চলে জ্বরজারি তো লেগেই থাকে সারা বছর, এখানে জঙ্গলের মধ্যে এত বৃষ্টিতে ভিজেও কিন্তু এরা সেই তুলনায় জ্বরে কমই ভোগে। পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা অনেক ছোটখাটো অসুখ অগ্রাহ্য করতে পারে, সংসারে কাজের জন্য শুয়ে থাকলে চলে না।

যাদুমনিও জ্বরতপ্ত শরীর নিয়ে সব কাজ করে যাচ্ছিল। সে আর মদন চাটাই বোনার কাজ করে। রান্নার ভারও তার ওপর। কমলিই প্রথম তার ছলছলে অরুণাভ চোখ দেখে সন্দেহ করে তার কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখেছিল। তারপর কমলিই জোর করে তাকে শুইয়ে দিয়ে তার কাজ আর তিনজনে মিলে ভাগ করে নেয়। এই সব ব্যাপারে কমলিরই খুব উৎসাহ।

কমলির দেখাদেখি ভান্‌তিও যায় সেবিকার দলে যোগ দিতে। কমলি বলে, তুই যা, তরে লাগবে না। আমরা চাইরজন আছি। তুই যা, দ্যাখ গিয়া সাঁইয়ের কখন কী লাগে। এটা বোঝোস না ক্যান?

তারপরই দুষ্টু হেসে বলে, কিছু হয় নাই এর মইধ্যে? শরীলে নখের আঁচড় আছে? দেখা তো, দেখা তো!

ভান্‌তিকে একটা ঠ্যালা দিয়ে সে আবার বলে, বোকা মাইয়া কোথাকার! যা, যা—

একই ঘরে রাতের পর রাত দু'টি পৃথক চাটাইয়ে শুয়ে থাকে ভান্‌তি আর লালন। কথাবার্তা বিশেষ হয় না। যে-যার সময় মতন ঘুমিয়ে পড়ে। এমনও হয়, অন্যদের সঙ্গে আলাপচারি করতে করতে লালনের অনেক রাত হয়ে যায়, সে যখন ঘরে আসে ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে ভান্‌তি। আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লালন জেগে ওঠে, বেরিয়ে পড়ে। তখনও ভান্‌তি জাগেনি, লালনের সঙ্গে তার দেখাই হয় না।

সেরকমই এক রাতে, যাতে ভান্‌তির ঘুম না ভাঙে সেই জন্য লালন যতদূর নিঃশব্দে সম্ভব চাটাইটা পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর সবেমাত্র তার ঘুম এসেছে, ভান্‌তি নিজের চাটাইয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, আপনে ঘুমাইলেন নাকি, সাঁই?

লালন চোখ মেলে বলল, না।

ভান্‌তি বলল, আপনের সাথে তো আমার কথাই হয় না। আমারে কি মনে আছে? আমি কেডা।

লালন বলল, মনে থাকবে না কেন? তুমি ভান্‌তি ঠাইরেন, না, না, ভানুমতী ঠাকুরানি।

আমারে শুধু ভান্‌তি ডাকলেই হবে। কমলিদিদি আমারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে কইছে। জিগাই?

জিগাও। যা মনে আসে সবই আমারে জিগাইতে পারো।

আমি সব শুনছি। আমারে জীয়ন্তে পুড়াইয়া মারার জন্য অরা নিয়া গেছিল শ্মশানে। আমার চৌদ্দো পুরুষের ভাইগ্য, সেই রাতে আপনেরা সেইখানে আইস্যা পড়েন। আমার হাঁটনের ক্ষমতা ছিল না, আপনে আর মনসুর মিঞা আমারে পিচ্ছিল পথ দিয়া কত কষ্ট কইরা লইয়া আসছেন। নাইলে আমি সেই শ্মশানেই পইড়্যা থাকতাম, আমারে ভূত-পেতনিতে ছিঁড়া খাইত। কী ঠিক কি না!

সে রাতে বড়ই দুর্যোগ ছিল। ভূত-পেতনিও বাহির হয় না। তুমি বাঁইচ্যা গেছ তোমার প্রাণশক্তির জোরে। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

সাঁই, আমি নিমিত্ত বুঝি না। আমি বুঝেছি, তুমি আর মনসুরই আমার সাক্ষাৎ প্রাণদাতা। কিন্তু প্রাণ দিয়া আবার পরিত্যাগ করতে চাও ক্যান?

পরিত্যাগের প্রশ্ন আসে ক্যামনে, ঠাইরেন? এখানে আইস্যা তুমি নতুন জীবন পাও নাই? পুরানো সব কথা ভুলে যাও, তাতেই শান্তি পাবে।

আমি নতুন জীবন পাইছি ঠিকই। সব কিছুই নতুন নতুন লাগে। এক একদিন ঘুম ভাঙ্গার পর প্রথম চক্ষু মেলে গাছপালার মাথার উপর দিয়া সুন্দর আকাশ দেখে ভাবি, সত্যি বুঝি স্বর্গে আসছি। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত কেউ একটাও কুবাক্য বলে না আমারে। এমনও যে জীবন হয়, স্বপ্নেও ভাবি নাই।

বাঃ, বেশ কথা। তুমি যে সকলের সাথে মানায়ে নিতে পারছ, সেটা আমার ভাল লাগে।

তুমিই এই জঙ্গলের মধ্যে একখান ছোট স্বর্গ গড়েছ।

যাঃ, একেবারে বাজে কথা। এসব কে বলেছে তোমারে? আমি আর কালুয়া নামে একজন প্রথম এসেছিলাম এখানে এই যা। তারপর একে একে আরও অনেকে এসে এটা গড়ে তুলেছে। সকলেই সমান অংশীদার। আমি তার বেশি কিছু না।

ঠিক আছে, এবার আসল কথা কই? তোমার কি বিরক্ত লাগছে? ঘুম আইস্যা গেছে? তাইলে চুপ করি।

লালন বলল, না, ঠাইরেন। সারা রাইত গল্প করলেও আমার বিরক্ত লাগে না। আগে একটা বিড়ি খেয়ে লই?

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ার ধার থেকে বিড়ির বান্ডিল খুঁজে নিল লালন। তার বালিশের নিচেই থাকে চকমকির পাথর।

চকমকি ঠুকে ঠুকে বিড়ি ধরাতে কিছুটা সময় লাগল।

তারপর বড় একটা টান দিয়ে সে বলল, এবার কও।

ভান্‌তি বলল, মাইয়া মানুষের একটা অবলম্বন লাগে। লতার মতন।

লালন বলল, ক্যান, ক্যান, মাইয়া মানুষরা নিজের পায়ে শক্ত হয়ে খাড়াইতে পারে না?

পারে, তাও কেউ কেউ পারে। সক্কলে পারে না। সোজা বৃক্ষ হওনের চেয়ে লতা হইতেই বেশি ভাল লাগে। আমারও তাই ভাল লাগে। নইলে স্বর্গসুখও কেমন যেন আলুনি লাগে। আমালি। আমগাছের গায়ে আলোকলতা দ্যাখছো? কী সুন্দর দেখায়।

আলোকলতার মূল নাই।

সাঁই, তুমি আর মনসুর আমার নবজীবন দাতা। এর মইধ্যে মনসুরের ঘরে বউ আছে, দায়-দায়িত্ব আছে। তোমার তো সেরকম কেউ নাই। তবে তুমি কেন আমারে নেবা না? কমলি এই কথাই জিগাইতে কইছে।

নেবা... মানে, ঠিক কী?

আমারে তোমার জীবনসাথী করে লও। আমার তো পশ্চাৎ-জীবন আর কিছু নাই।

জীবনসাথী কথাটারও তো অনেকরকম অর্থ হয়।

সাঁই, আমার বিদ্যাশিক্ষা নাই, তা বলে একেবারে নির্বোধ তো না। তুমি আমারে ভাবের কথা শুনাইয়ো না। রূপ-অরূপের কথা বলো না। হেঁয়ালি কইরো না। সোজাসুজি, সাধারণ মানুষের মতন, জীবনসঙ্গী যারে বলে—

ঠাইরেন, আমি তোমারে সোজাসুজিই কই। আমি তোমারে বিয়া-শাদী করতে পারবো না। তুমি যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকো।

ক্যান বিয়া করতে পারবে না? আমি হিন্দু, তাই? আমার মুসলমান হইতে আপত্তি নাই।

হিন্দু-মুসলমানের কথাই আসে না। স্ত্রীলোকেরা বিবাহ করতে চায় কেন? তারা একটা স্বামী চায়, সংসার চায়, সন্তান চায়। আমি তেমন কিছুই দিতে পারবো না। সংসার কোথায়? এ তো মায়ার সংসার! কবে খানখান হয়ে যাবে তার ঠিক নাই। আর সন্তান...

আমার সংসার চাই না। তুমি আমারে তোমার পাশে রাখলেই হইল।

কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানও দিতে পারবো না। সে জন্য তুমি কষ্ট পাবে। পরে আমারে দুষবে।

কেন, সন্তান দিতে পারবা না কেন? তুমি কি... তাইলেও আমি।

না, না, সে সব কিছু না। ক্ষমতা থাকলেও আমি সন্তানের জন্ম দেওয়ায় বিশ্বাস করি না।

ক্যান?

বুঝাইয়া বলা শক্ত। তবে আমার মনে হয়, সন্তানের পিতা-মাতারা বড় স্নেহে অন্ধ হয়। নিজের সন্তানদের বুকে চেপে রাখে, অন্যের সন্তানদের ঠিক সেই মতো ভালবাসতে পারে না। ভালবাসার এই ভাগাভাগি আমার সহ্য হয় না।

অদ্ভুত কথা। সক্কলেই এমন হবে নাকি?

হয়তো হয় না। হয়তো আমি কোনও সন্তানের বাপ হলে আমিই স্বার্থপর হয়ে যাবো! সেই জন্যই আমি—

সাঁই, একটা সত্য কথা বলবে? তুমি কি স্ত্রীলোকদের পছন্দ করো না? তুমি কি তাদের দিকে চাইতেও চাও না? মুখ ফিরায়ে থাকো?

আমার এখন কী হইছে, মিথ্যা কথা মুখেই আসে না। তোমারে কী করে বুঝাবো? নারীরা তো মাধুর্য রসের আধার। আমি কি তাদের থেকে মুখ ফিরায়ে থাকতে পারি? তাদের একটুখানি হাসি, তাদের একটুখানি ভ্রূভঙ্গি দেখলেই আমার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়। এমনকী নারীদের পায়ের পাতা দেখলেও, এটা আমার একটা গোপন কথা, ইচ্ছা করে, সেই পায়ের পাতা বুকে চেপে ধরি।

বুঝেছি। আমি তেমন কেউ না। তোমার কল্পনায় অন্য নারী আছে।

তাও ঠিক না। এক একসময় তুমিও তো ডানা মেলা পরি হয়ে যাও। সত্য কথা এই যে, ইচ্ছা করেছে, তোমারে বুকে ধরে রাখি। কিন্তু...

কিন্তু কী? কেন এই সব কথা আমারে আগে বলো নাই?

নারী ও পুরুষের যেরকম মিলনে সন্তান জন্মায়, আমি যে সেই রূপ মিলন চাই না। কোনও নারীকে কাছে পেতে চাইলে সে তো তেমন মিলন চাইতেই পারে। তখন আমি রাজি না হলে সে কষ্ট পাবে। তাই আমি...

এরপর একটুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইল।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে ভান্তি বলল, এতক্ষণ যা কথা হইল সব মুইছ্যা ফেল। সব সাদা। এবার আর একটা কথা কইতে পারি?

লালন বলল, অবশ্যই পারো। বলো, বলো—

ভান্তি বলল, একলা এই চাটাইতে শুইতে এক-এক সময় বড় ভয় ভয় করে। আমি তোমার পাশে গিয়া একটু শুইতে পারি? বেশিক্ষণ না।

লালন বলল, এসো—

ভান্তি উঠে এসে তার পাশে শুয়ে পড়তেই লালন দু'হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল নিজের বুকের আশ্রয়ে।

এবার শুরু হল ভান্তির কান্না।

পরের দিন লালনের ঘুম ভাঙল বেশি দেরিতে।

মাঝে মাঝে এরা কয়েকজন দল বেঁধে বাজারে যায়। নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে প্রয়োজনীয় চাল-ডাল ও সবজি এবং সূচ-সুতো, পেরেক, হাতুড়ি ইত্যাদি কিনে আনার জন্য। আজ লালনের সেই দলে যাওয়ার কথা।

চাল-ডাল-মশলার মতন কিছু কিছু দ্রব্য, যা প্রতিদিন কাজে লাগে, সেগুলির জন্য বাজার-নির্ভর না-হয়ে শিমুলতলাতেই একটা দোকান খোলার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। গ্রাম ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, আরও কিছু কিছু দ্রব্য ও বস্তু সুলভ হওয়া দরকার।

লালনরা বাজারে পৌঁছল বেশ বেলাতেই। সবাই যখন কেনাকাটিতে ব্যস্ত, তখন এক ব্যক্তি লালুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আরে, তুই লালু না? আরে লাউল্লা, তুই কী করোস এহানে?

এ যেন পূর্বজন্ম থেকে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

লালু চিনতে পারল, এই মোটা মোচওয়ালা ব্যক্তিটি কবিরাজ মশাইয়ের দেহরক্ষী যদু। এর মধ্যে তার বেশ বয়স হয়েছে, গলার আওয়াজে আর বাজখাঁই জোর নেই।

সে বেশ নরম গলায় বলল, ওরে লাউল্লা, কী হইছে, তুই জানোস না। আয় আমার সাথে।

তার সঙ্গে যেতে যেতে লালু শুনল, কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এই পথ দিয়ে রুগি দেখতে যাচ্ছিলেন, তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনও আকুল আহ্বান শুনলে তিনি না গিয়ে থাকেন না।

যেতে যেতে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন।

তেমন কিছু চোট লাগেনি, কিন্তু মনে হয় তাঁর নিম্নশরীরে হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। ঘোড়ায় চড়া দূরের কথা, তিনি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না। এখানে একধারে তাঁকে একটা কেদারায় বসিয়ে রাখা হয়েছে, কয়েকজন গেছে পালকি কিংবা ডুলি জোগাড় করতে।

কবিরাজ মশাইকে অনেকেই চেনে, তাই তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। কবিরাজ মশাইয়ের মুখটা ঝুঁকে গেছে, চিবুক ঠেকেছে বুকে। একদিকের কাঁধ উঁচু, অন্য দিকটা নিচু, কেমন যেন ভাঙাচোরা চেহারা। তাঁর ঘোড়াটা অদূরে বাঁধা।

যদু 'হুজুর' বলে একবার ডাকতেই তিনি মুখ তুললেন।

ঘোলাটে চোখে লালনকে দেখে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি স্থির করলেন। চিনতে পারলেন ঠিকই।

তিনি ধীর স্বরে বললেন, লালু না? আছিস কেমন?

লালন অতি বিনীতভাবে বলল, আপনার আশীর্বাদে সুস্থই আছি হুজুর।

কবিরাজ বললেন, উঁহু, আমার আশীর্বাদে না। ওরে, তোর কথা আমি প্রায়ই ভাবি। তোরে নিয়া আমার যে ভুল হইছিল, তেমন আর কখনও হয় নাই। শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে পর্যন্ত আমি মানুষরে বাঁচাবার চেষ্টা করি, আর তোর আয়ু আছিল, তবু তোরে আমি মৃত্যু-নিদান দিলাম! এখনও সে জন্য আমি নিজেরে ক্ষমা করতে পারি না। তুই কী করোস এখন?

লালু কিছু বলার আগেই যদু বলল, কর্তা, অরে এখন মাইনষে ফকির লালন কয়। অনেক গান করে।

কবিরাজ বললেন, গান! তা কি আমার আর শোনা হবে? আমার সময় ফুরায়ে এসেছে। এখন বাড়িতে গিয়া নিজের বিছানায়... ওরে, পালকি পাইলি?

যদু বলল, আনতে গেছে হুজুর। আইস্যা পড়বে।

কবিরাজের মাথাটা আবার ঝুলে যাচ্ছিল, তিনি জোর করে সোজা করলেন। তারপর বললেন, ফকিরি... শোন লালু, আমার ঘোড়াটা তোরে দিলাম। তোর কাজে লাগবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা প্রস্তাব শুনে লালন প্রায় কেঁপে উঠল। সে বলল, এ কী কইলেন কর্তা, আপনের ঘোড়া!

কবিরাজ বললেন, আমার তো আর কাজে লাগবে না। ইহজীবনের মতন শেষ। তুই নে।

লালন বলল, কর্তা, আপনে একবার কইছিলেন, নিজ উপার্জনে ঘোড়া কিনতে না পারলে...

কবিরাজ বললেন, এই দানে দোষ নাই। বড়রা কিছু দিলে গ্রহণ করা যায়। শাস্ত্রেও আছে, যাচা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামর। শাস্তর

না কালিদাস? ভুল হয়ে যাচ্ছে...

ঘোড়াটা পাবার পর লালনের মনে হল, এইটাই যেন তার জীবনের চরম প্রাপ্তি। ঘরে ফিরে আসার পর সকলেই হর্ষে মেতে উঠল। একমাত্র কেউকেটা ব্যক্তিরাই এ অঞ্চলে ঘোড়ায় চেপে ঘোরে। শিমুলতলায় এই নতুন বসতির একমাত্র লালন সাঁই-এর ঘোড়া আছে, সে-ই তো এখানকার যোগ্যতম নেতা!

লালন যতই না না বলে, কেউ আর কর্ণপাত করে না।

লালন তার পূর্বজীবনের কথা বলে না কারুকেই। সেই ঘোড়া চুরির দিনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে আপন মনে মুচকি মুচকি হাসে।

ঘোড়াটা পাবার পর থেকে পরিচিত বৃত্তের বাইরে লালনের দূর দূরে যাওয়া বেড়ে গেল। আগে সে যেত রণপায়ে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে, এখন অশ্বপৃষ্ঠে সে একা।

এদিকে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, অন্যদিকে খুলনা, ফরিদপুর ঘুরতে ঘুরতে একদিন পাবনায় এসে আর এক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গেল। সেই ঐশ্বর্যপতির নাম সিরাজ সাঁই।

একটা আখড়ায় নানান বাউল ও ফকিররা গান গাইছে, সেখানে একপাশে বসে আছেন সিরাজ সাঁই এবং তার পাশে, কী আশ্চর্য না আশ্চর্য, লালনের হারানো বন্ধু সুলেমান মির্জা ওরফে কালুয়া!

লালন প্রায় দৌড়ে গিয়ে সিরাজ সাঁই-এর হাঁটু ছুঁয়ে কদমবুসি করল।

সিরাজ অবশ্য তাকে চিনতে পারলেন না। হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি কে?

লালন বলল, সাঁই, আপনে আমারে দেখছিলেন ললিতপুর গেরামে রাবেয়া খাতুনের কুটিরে। আমি মুমূর্ষু ছিলাম, আপনি আমারে বাঁচায়েছিলেন।

সিরাজ বললেন, মনে পড়ছে। তোমার মসুরিকা রোগ হইছিল। আমি তো তোমারে বাঁচাই নাই। তোমারে বাঁচায়েছিল রাবেয়া বেগম।

লালন বলল, পুণ্যবতী রাবেয়া বেগম আমার প্রাণ বাঁচায়েছিলেন ঠিকই, আর আপনে আমারে নবজীবন দান করেছিলেন। আপনার দর্শন পেয়েই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। অবশ্য পুরাটা খোলে নাই, একটা চক্ষু শুধু।

সিরাজ বললেন, বসো। পরে কথা হবে।

এই গান-বাজনার মাঝখানে বেশি কথা বলা উচিত নয়। লালন একপাশে জায়গা করে নিয়ে বসে ফিসফিস করে কালুয়াকে বলল, কেমন আছ, দোস্ত?

কালুয়া ফুঁসে উঠে বলল, কে তোর দোস্ত? আমি তোরে চিনি না। আমি আল্লার বান্দা, আমার আর কেউ নাই!

কাছেই এক কুটিরে সিরাজ সাঁই-এর বর্তমান অবস্থান। গানের পালা শেষ হলে তিনি লালনকে সঙ্গে ডেকে নিলেন। আর বিনা আহ্বানেই কিছু লোক চলল এদের পিছনে পিছনে।

ঘরখানি বিশেষ বড় নয়, এত মানুষের ঠাঁই হওয়া মুশকিল, তবু সবাই বসল ঘেঁষাঘেঁষি করে। মাঝখানে একটা মাদুরে বসে সিরাজ লালনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কী করো?

লালন বলল, তেমন কিছু না হুজুর। এখন আর সমাজের মইধ্যে থাকি না। জঙ্গলের মইধ্যে বসতি করেছি, এই কালুয়া ছিল সঙ্গে।

কালুয়া হুংকার দিয়ে বলল, না, ছিলাম না। আমি কোথাও ছিলাম না। এখনও নাই। এখানেও নাই!

সিরাজ সস্নেহে তার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, এই বদ্ধ পাগলটারে নিয়ে কী করি বলো তো! কখনও ও নিজেরে কয় আল্লার বান্দা, আবার কখনও কয়, আমি কালীমায়ের সন্তান! থাউক, আছে থাউক। তুমি সেই জঙ্গলে একা থাকো?

লালন বলল, না হুজুর, একে একে অনেকেই সেখানে এসে ঘর বেঁধেছে। আমারই মতন সমাজ থেকে খেদান, ধর্ম থেকে খেদান, গরিব-দুঃখী, ছোটলোক-মোটোলোক। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে। আমরা বেশ সুখেই আছি জঙ্গলবাসী হয়ে।

সিরাজ জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে? কোনও কাজিয়া হয় না?

লালন বলল, কিছুই হয় না। যার যার ধর্ম আছে, কিন্তু জাত ধুয়ে ফেলেছি। ছোঁয়াছানি নাই।

সিরাজ বললেন, অপূর্ব। এভাবেও যে মহানন্দে বাঁচা যায়, তা কেন অনেকে বোঝে না! ধর্ম কি অন্যের সঙ্গে কোন্দল করার জন্য, না মানুষকে ভালবাসার জন্য? আমার ধর্ম সর্বোত্তম আর অন্য ধর্মের সকলে পাপী, এ কি কোনও ধর্ম শিখায়? না, না, না! এমন যারা ভাবে, তারাই পাপী।

একজন লোক বলে উঠল, কিছুদিন আগে কুমারখালির কাছে গোরাই নদীতে লালন ফকির নামে একজন তার দলবল নিয়ে পানিতে ঝাঁপায়ে পড়ে এক সাহেবের জাহাজ রুখে দিয়েছিল শুনেছি, আপনি কি সেই লালন ফকির?

লালন বলল, প্রায় এক হাজার মানুষ নিজে নিজেই জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, আমি তাদের একজন মাত্র, আর কিছু না।

সেই কাহিনিটা আর একটু বিস্তৃতভাবে শুনে নিয়ে সিরাজ জিজ্ঞেস করলেন, লালন, তোমার সাধনা কী?

লালন বলল, আমার তো জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই, সাধনাও নাই। আমার খালি মনে হয়, এই যে মানব দেহখানা, এটার মইধ্যেই যেন গোটা বিশ্ব রয়েছে। এ এক আজব রংমহল। এই আজব কারখানার মধ্যে একজন কেউ আছে, টের পাই, কিন্তু তারে দেখতেও পাই না, বুঝতেও পারি না।

সিরাজ বললেন, তবে তো তুমি ঠিকই পথ ধরেছ। মহাবিশ্ব কিংবা আলসে বাগীর, সেখানে আল্লাহর দরবার, যেমন ধরো আলিপুরের কাছারি, এই মানব দেহের মধ্যেও তা আছে।

লালন ব্যাকুলভাবে বলল, সাঁই, আর একটু বুঝায়ে কন।

সিরাজ বলল, বুঝতে হবে না। যার বোঝার সে নিজেই বুঝবে। তুমি যে রংমহলের কথা বললে, তাতে কিন্তু তালা লাগানো আছে। ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে সেই তালা খোলা শিখতে হয়।

লালন ও সিরাজের কথোপকথনে অন্যরা ধৈর্য ধরতে পারল না।

একজন বলে উঠল, সাঁইজি, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমরা এই যে গান গাই, এই জন্য অনেক মোল্লা-মুরুব্বি রাগ করে, মারতেও আসে। কয় যে মোছলমানের গান গাওয়া গুনাহ্! সত্যিই কি তাই? সম্রাট আকবরের সভায় তানসেনের নাম শুনেছি... তবু এমন কথা...

সিরাজ বললেন, মোল্লা-মুরুব্বিরা যদি সঙ্গীতরে হারাম কয়, তর্ক করতে যাইও না। তর্কে তো কোথাও পৌঁছনো যায় না। মেনে নেবে। নিজের কান ধরে বলবে, হুজুর গুস্তাকি হইছে, মাফ করেন। আর আপনার সামনে গাইব না। তারপর নিজের মনে মনে গাইবে, যারা তৃষ্ণার্ত তাদের সঙ্গীত রূপ সুধা বিলাবে।

লোকটি আবার বলল, আপনার কাছ থিকা উত্তর তো পাইলাম না। সঙ্গীত কি হালাল না হারাম?

সিরাজ বললেন, তর্কের জন্য না, তোমার নিজের জন্য জেনে রাখো। হাদিসে নিষেধ নাই। একটা কিস্যা শুনো। এক ঈদের দিনে দু'জন বাঁদী দফ বাজিয়ে গান করছিলেন বিবি আয়েষা সিদ্দিকার সামনে। হজরত রসুল সেখানে শুয়ে ছিলেন। এক সময় আবু বকর সেখানে ঢুকে অবাক হয়ে বললেন, এ কী, আল্লাহ রসুলের ঘরে শয়তানের গান? তিনি বকাবকি করতে লাগলেন বাঁদিদের। তখন হজরত পাশ ফিরে বললেন, ঈদের দিনে দফ বাজিয়ে গান মোবাহ্, অর্থাৎ নির্দোষ। কোনও রকম কু-আসক্তি না থাকলেই হল। আরও একটা ঘটনা শুনবা?

হুঁকোয় দু'টান দিয়ে সিরাজ বললেন, হাদিশ শরিফে আছে, ঈদের দিনে এক মসজিদের মধ্যে হাবশি গোলামরা মহানন্দে নাচ-গান করছিল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে তা শুনে রসুল দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে ছিলেন বিবি আয়েষা। রসুলের প্রসারিত এক পবিত্র বাহুর ওপর থুতনি রেখে আয়েষা সেই নাচ-গান-কৌতুক উপভোগ করতে লাগলেন। তা হলেই তোমরা বুঝে নাও!

অন্য একজন বলল, সাঁই, আর সেই হজরত উমার রা-এর কাহিনিটা?

সিরাজ বললেন, হুঁ, সে কাহিনিও খুব মর্মস্পর্শী। খলিফাদের আসলে নানাবিধ পাপ-ব্যবসা বন্ধ করার জন্য নাচ-গানের ওপরেও নিষেধ জারি করা হয়েছিল। এক রাতে হজরত উমার রা একা হেঁটে যাচ্ছিলেন মদিনার

পথ দিয়ে। হঠাৎ এক বাড়ির ভিতর থেকে সংগীতের সুর ভেসে এলো তার কানে। তিনি ভাবলেন, বুঝি এখানে গোপনে পাপ ব্যবসা চলছে। তিনি ধড়াম করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। গিয়ে দেখলেন, আর কেউ নাই, শুধু একটি অল্পবয়সি সুন্দরী যোবতী আপন মনে গান গেয়েই চলেছে। হজরত গর্জন করে বললেন, তুই কে রে? খলিফার নির্দেশ অমান্য করে গান করিস? তখন সেই যোবতী তেজের সঙ্গে কইল, আপনে ক্যান কোরান শরিফের নির্দেশ অমান্য করি বিনা অনুমতিতে অন্দরমহলে এসে ঢুকলেন? কোরানে নির্দেশ আছে, অপরের কোনও গৃহে প্রবেশ করতে গেলে সদর দরজায় দাঁড়াতে হয়, যার সঙ্গে দেখা করতে চান, আগে তাকে সালাম দিতে হয়। নিজে আপনি আল্লাহ'র নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমাকে খলিফার নির্দেশ নিয়ে হুমকি দিতেছেন?

এমন বকুনি খেয়ে হজরত-এর চৈতন্য হল। তিনি তখন বিনীতভাবে বললেন, মা, আমার দোষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তুমি কেন গান গাইছিলে?

সেই কন্যা তখন জানাল যে, তার বিবাহের পনেরোদিন পরই তার স্বামী চলে গিয়েছে জিহাদে। কবে ফিরে আসবে তার ঠিক নাই। তার মনের অবস্থা আর তো কেউ বুঝবে না। তাই গান গেয়ে সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিতেছে।

হজরত তখন লজ্জিত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। তাঁর কন্যা সুমনীনরে ডেকে জিগাইলেন, কও তো মা, নারীরা কতদিন পতি-বিরহ সইহ্য করতে পারে? কন্যা উত্তর দিলেন বড়জোর তিন মাস, তারপর তার মর্মবেদনা অসইহ্য হইয়ে যায়।

তা শুনে হজরত উমার রা ঘোষণা করে দিলেন, এখন থেকে আর কোনও সৈনিক তিন মাসের বেশি বাইরে থাকবে না। ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসতে পারবে।

প্রথম যে-ব্যক্তিটি প্রশ্ন করেছিল, সে বলল, আঃ, আপনে আমারে বাঁচাইলেন। মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ ছিল। এখন মুক্ত কণ্ঠে গান গাইতে পারি। আসেন আর কথা নয়, সকলে একখান গান ধরো।

কেউ কিছু শুরু করার আগেই কালুয়া বিকট চেঁচিয়ে গেয়ে উঠল, এবার কালী তোমায় খাব/ খাব খাব গো দীন দয়াময়ী/ এবার কালী তোমায় খাব!

সকলেই কয়েক মুহূর্ত নীরব।

লালন রীতিমতন ভয় পেয়ে বলে উঠল, এ কী গান? চুপ, চুপ, চুপ!

তাতে কান না দিয়ে কালুয়া আরও গাইল: ডাকিনী যোগিনী দুটা তরকারি বানায়ে খাব/ তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্ভার চড়াব/ এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যা...

লালন ব্যাকুলভাবে সিরাজের জানু চেপে ধরে বলল, সাঁইজি, অরে থামান। এমন গান শুনলে হিন্দুরা যে ওকে পিটায়ে মেরে ফেলবে!

সিরাজ শান্তভাবে বললেন, ওরে আমি থামাব কী করে, ও কি কারুর কথা শোনে? ও আছে নিজের খেয়ালে—

লালন আবার বলল, কিন্তু হিন্দুরা...

সিরাজ বললেন, মারলে মারবে। আমি বাঁচাব কী করে। না জেনে বুঝেও তো অনেক মানুষ অনেক নৃশংস কাজ করে। অনেক হিন্দু জানেই না যে, এ গান খুব বড় হিন্দু সাধকেরই রচনা। তাঁর নাম শ্রীরামপ্রসাদ সেন। এ গান আমরা বুঝবও না। প্রতিটি কথার মধ্যে অনেক উচ্চস্তরের ভাব আছে। রূপক আছে। সাধনার অনেক ঊর্ধ্ব মার্গে না উঠলে এসব গুহ্যতত্ত্ব বোঝা যায় না।

কালুয়া এখন দু'হাত তুলে নেচে নেচে গাইছে: যদি বলো কালী খেলে নামের হাতে ঠেকা খাব/ আমার ভয় কী তাতে কালী বলে কামেরে কলা দেখাব...

সিরাজ সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, এর অর্থ বুঝলে কিছু?

লালন বলল, বাপরে বাপ। কী সব ভয়ঙ্কর কথা, বুঝে আমার কাজ নাই।

সে উঠে গিয়ে কালুয়াকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগল, ওরে থাম, থাম। যথেষ্ট হয়েছে, আর না!

কালুয়ার গায়ে যেন এখন অসুরের শক্তি। সে এক ঠেলা দিয়ে লালনকে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, দূর হ! তুই কে রে? তোর গুষ্টির পিণ্ডি চটকাব আমি।

লালন হাত জোড় করে দারুণ মিনতি করে বলল, শান্ত হ, শান্ত হ। চল আমার সঙ্গে, অন্তত কয়েকটা দিন থেকে আসবি। ওখানে সকলেই তোরে দ্যাখতে চায়।

কালুয়া তেড়ে এসে জোরে জোরে লালনকে লাথি কষাতে কষাতে বলতে লাগল, যাব না, যাব না। কোথাও যাব না। তোরে চিনি না। কাউরে চিনি না।

তারপর সে একটা সম্পূর্ণ অন্য গান ধরল: মৃত্তিকার ঘট মধ্যে এ তিন ভুবন/ মৃত্তিকার পাঞ্জরে আল্লার সিংহাসন...

১২

শীতের সোনালি রোদে গা এলিয়ে কাটানো হচ্ছে একটা অলস দুপুর। কেউ শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, কেউ বসে আছে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িতে।

একপাশে কয়েকজন বেঁটে বাটকুল গনাই শেখকে ধরে শুনছে লালনের কয়েকটি গান। লালনও উৎফুল্ল ভাবে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। মজার কথা এই, লালন নিজেই তার ভুলে-যাওয়া গান নতুন করে শিখে নেয় গনাইয়ের কণ্ঠে শুনে। এখন কোথাও গেলে কেউ কেউ লালনের কাছে গান শুনতে চায়। লালন তো যখন তখন গান সৃষ্টি করতে পারে না। বুক ঠেলে যখন নিজে নিজে আসার, তখন আসে। সেই জন্যই দু'চারখানা গান শিখে রাখা দরকার।

এমনও হয়, গনাইয়ের গাওয়া কোনও গান শুনে লালন সবিস্ময়ে বলে ওঠে, এই গান আমি গাইছি নাকি?

অন্য সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

যে নিজে গান বানিয়েছে, তার মনে নেই। কিন্তু শ্রোতাদের মনে আছে।

এখন লালন কোনও এক ভ্রাম্যমাণ বাউলের কাছ থেকে গুপিযন্ত্র বাজাতে শিখে নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই পিড়িং পিড়িং করে বেশ মজা পায়। গানের সঙ্গেও বাজাতে পারে।

লালন বাইরের কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এলে এখানকার বাসিন্দারা সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চায়। এদের মধ্যে অনেকেই কাছাকাছি দু'-চার খানা গ্রামের বাইরে অন্য কোথাও যায়নি। এদের বাপ-ঠাকুরদাও একটা ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যেই জীবন কাটিয়ে গেছে।

এবারে পাবনায় গিয়ে লালনের অনেক গভীর অভিজ্ঞতা হয়েছে। সিরাজ সাঁইয়ের চরণ ধরে সে তিন দিন পড়েছিল। আসতে ইচ্ছেই করছিল না। লালনের এমনই হয়। বাইরে কোথাও গিয়ে খুব ভাল লেগে গেলে সেখানেই আরও থেকে যেতে ইচ্ছে করে, আবার জঙ্গলের মধ্যে তার কুটির, এখানকার মানুষজনও তার মন টানে।

কত তত্ত্ব, ইসলামি শাস্ত্র, এমনকী হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কেও সিরাজের অগাধ জ্ঞান, কিন্তু তিনি মুখে বড় বড় কথা বলেন না, হাসি-মশকরা, গল্প-কাহিনি, গান এই সবের মধ্যেই সেই সব ফুটে বেরয়।

এবারে লালনের বেশি লাভ হয়েছে, সে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছে।

হিন্দু ও মুসলমান কত শত বছর ধরে পাশাপাশি বাস করছে এ দেশে, অথচ তারা পরস্পরের ধর্ম ও সামাজিক নীতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। এই অজ্ঞতা থেকেই তো বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ হয়।

যেমন হিন্দুদের মূর্তিপূজক ভেবে মুসলমানরা কেমন যেন অবজ্ঞা করে। কিন্তু এই মূর্তিগুলো তো সব বিভিন্ন রূপ ও গুণের প্রতীক। প্রতিমা কথাটার মানেই যে তাই, তা লালনও সদ্য জেনেছে। হিন্দু ধর্মের যে পরমেশ্বর কিংবা পরম ব্রহ্ম তাঁর তো কোনও মূর্তি কিংবা রূপ নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও সেই পরম ব্রহ্মেরই বন্দনা করেন। আবার ইসলাম ধর্মে যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদার আহ্বান, তা হিন্দুরা বোঝে না। ইসলাম সব মানুষকে সমান করে, আর হিন্দুরা নিজেদের মধ্যেই নানান জাতিভেদ করে নানান ছুতোয় অনেক মানুষকে বিতাড়িত করে।

তবু মুসলমানেরা হিন্দুদের সম্পর্কে যতটুকু জানে, হিন্দুরা মুসলমানদের সম্পর্কে জানে তারও অনেক কম। জানতেও চায় না। অন্যদের দূরে সরিয়ে রাখাই যে তাদের ভ্রান্ত নীতি।

এখানে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লালন বুঝেছে, এখানকার মুসলমানরাও নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানে খুব কম। আসলে দু'-এক পুরুষ আগে হিন্দু সমাজে অত্যাচারিত হয়ে এদের বাপ-দাদারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাতে অনেকেরই দারিদ্র ঘোচেনি, শিক্ষার সুযোগ পায়নি, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াইতেই এত ব্যস্ত যে, নতুন ধর্মের মূলতত্ত্ব বোঝারও অবকাশ হয়নি, শুধু মৌলবিরা মাথার মধ্যে কিছু সংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর একটা কথাও সত্যি যে, ইসলামে সব মানুষ সমান বলা হলেও তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না সবসময়। ধনী আর অতি দরিদ্র মুসলমান তো পাশাপাশি খেতে বসে না কখনও। শিয়া আর সুন্নিদের তফাত নিয়ে মারামারিও হয়। হিন্দু জমিদার যেমন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চাষীদের ওপর অত্যাচার করে, তেমনই মুসলমান জমিদারও তো অসহায় মুসলমান চাষীদের রেয়াত করে না।

লালনের আফশোস হয়, যদি সে কিছুটা লেখাপড়াও জানত, তা হলে সে রামায়ণ-মহাভারত আর কোরান-হাদিস নিজে পাঠ করে বুঝে নিতে পারত। কিন্তু বাল্যকালে কেউ তার হাতে একটা খাগের কলমও ধরিয়ে দেয়নি। কী আর করা যাবে, এখন জ্ঞানী মানুষদের কাছ থেকে শুনে শুনে যতটুকু শেখা যায়।

পাবনার গল্প করতে করতে কালুয়ার কথা এসে পড়ে। শিমুল গাছতলার এই যে নতুন গ্রাম দিন দিন বেড়ে উঠছে, কালুয়াই তার প্রথম স্থপতি। লালন তাকে পরম সুহৃদ হিসেবে পেয়েছিল। এবারে কালুয়ার দেখা পেয়ে সে তাকে এখানে একবার ফিরিয়ে আনার খুব চেষ্টা করেছিল। কালুয়া তাকে মেরেছে ধরেছে, তবু সব সহ্য করেও কাকুতি-মিনতি করেছে লালন। কালুয়ার এখন চরম উন্মাদনার দশা।

কালুয়ার কথা বলতে বলতে লালন আড়চোখে কমলির দিকে তাকায়। কালুয়া কেন ফিরতে চায় না, তা আর কেউ না বুঝুক, কমলি অবশ্যই বোঝে।

কমলির দিক থেকে কোনওই সাড়া পাওয়া যায় না। নিরেট মুখ করে সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

মদিনা শহরে এক স্বামী বিরহিনী যুবতীর গান শুনে হজরত রা-এর মন গলে যাওয়ার কাহিনিটি শুনে সকলেই বাহবা দিয়ে ওঠে।

একজন বলল, আহা-হা। বিরহের গান শুনে মন গলে না এমন পাথরও কি কেউ আছে?

লালন গুপিযন্ত্রটা বাজাতে বাজাতে বলল, এক হিসাবে সব মানুষের গানই তো বিরহের গান।

মনসুর বলল, এডা তুমি কী কইলা লালন? সবই বিরহের প্যানপ্যানাইয়া গান? আরও কত গান আছে। মারফতি গান। বাউল-ফকিররা যে নবী আর রসুলের নামে গান করে, তাও কি?

লালন বলল, ভাল কইর‍্যা ভাইব্যা দেখো। আল্লা রসুলই বলো কিংবা হিন্দুগো যে ঠাকুর-দেবতার গান। সবই তো জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষা। যতদিন মিলন না হয়, তারেই তো বিরহ কয়।

মনসুর বলল, আর একটু বুঝাইয়া কও!

লালন আর কিছু বলার আগেই দূর থেকে একজন চেঁচিয়ে জানাল, লালন, একটা খুব মন্দ সংবাদ আছে।

লালন বলল, কাছে আইস্যা কও!

লোকটির নাম সিজান। সে বাইরের গ্রামে কোনও কাজে গিয়েছিল। দৌড়ে দৌড়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, খাড়াও, আসি।

সে একটা গাছের আড়ালে হিসি করতে বসে গেল, অন্যদের উৎকণ্ঠায় রেখে।

একটু বাদে সিজান বলল, জমিদারের অত্যাচার শুরু হইছে। আমি শুইন্যা আসলাম, হরিনাথ মজুমদারের বাড়িতে লেঠেল পাঠাইছে ঠাকুরবাবুরা। এতক্ষণে মনে হয়, সব শ্যাষ!

লালন উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, সব শ্যাষ মানে? তুমি নিজের চক্ষে কী দ্যাখছো আর কী শুনছ, তাই কও।

সিজান বলল, আমি দেখি নাই কিছু। হাটে শুনছি। জমিদারের লেঠেল বাহিনী আইস্যা হরিনাথের বাড়ি ঘেরছে। হরিনাথরে ধইর‍্যা নিয়া যাবে তার বাড়িতে আগুন দিবে।

শীতল বলল, ক্যান, ক্যান? হরিনাথের তো জমি-জিরেত কিছু নাই। জমিদার তারে ধরবে ক্যান?

সিজান বলল, তা আমি ক্যামনে জানমু? হাটের মানুষজন খুব চিল্লাচিল্লি করছে, কিন্তু ওই বাড়ির কাছে যাইবার সাহস কাউর নাই।

লালন জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে আগুন ধরাইছে? হরিনাথরে নিয়া গেছে?

সিজান বলল, অতদূর শুনি নাই। হরিনাথ নাকি বাড়িতে নাই, কোন গেরামে গেছে, ফিরা আসলেই ধরবে। তয় এতক্ষণে বাড়িতে আগুন লাগাইছে বোধ হয়।

লালন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাইলে তো আমাগো যাইতে হয়। আমরা হরিনাথের পাশে দাঁড়াব।

মনসুর বলল, জমিদার পাইক-বরকন্দাজ পাঠাইছে... আমরা গিয়া কী করতে পারব?

লালন বলল, বন্ধুর বিপদের সময় আমরা তার পাশে যাব না?

মনসুর বলল, সে কথা ঠিক। কিন্তু জমিদারের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া!

লালন বলল, আমরাও তো লাঠি খেলা শিখছি। আমরা যথাসাধ্য আটকাব। আর যদি না পারি তো পারব না। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

শীতল বলল, মাথা ঠান্ডা কইরা একটু ভাবো লালন। আমরা এইখানে বাড়ি ঘর করছি, আমাগো কাউরই জমির পাট্টা নাই। জমিদার এতদিন তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। এখন আমরা যদি এই সব ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ি, তাইলে আমাগো উপর জমিদারের নজর পড়বে। তারপর আমাগো কী হবে? এখন জমিদারের পাঁচ-ছয়জন লাঠিয়াল আসছে, এরপর যদি পঞ্চাশজন আসে?

লালন হেসে বলল, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখন আমি আমার বিবেককে ঘুম পাড়াতে রাজি না। পরে যা হয় হবে। আমি যাবই, তোমরা কে কে যেতে চাও সঙ্গে বলো। আর যদি কেউ না চাও, তবু আমি...

মনসুর বলল, আরে না, না, সে কথা না। তুমি গ্যালে আমরা সবাই যাব। কি, ঠিক না?

এবার সকলে সমস্বরে বলল, নিশ্চয় যাব। সক্কলডি যাব।

শীতল বলল, আমি তো যাবই। লালন, আমরা মরতে ভয় পাই না। আমাগো এই গেরাম যদি জমিদার ভাঙতে আসে, আমি আগে প্রাণ দেব।

লালন বেছে নিল ছ'জনকে। তারপরে রণপায়ে রওনা দিল দ্রুত।

হরিনাথের গ্রামে এই দলটি পৌঁছে গেল সন্ধের একটু আগে।

সিজানের খবর মিথ্যে নয়। তবে হরিনাথের বাড়িতে এখনও আগুন লাগানো হয়নি। বাড়ি ঘিরে বসে আছে ছ'জন লাঠিয়াল। উঠোনে একটা টিনের চেয়ারে বসে তামাক টানছে একজন নায়েব-শ্রেণির মানুষ। ফরসা, টুকটুকে চেহারা, মাথায় একটাও চুল নেই কিন্তু গোঁফের বেশ বাহার আছে। মাথায় চুল নেই বটে, কিন্তু ভুরু দু'টি বেশ মোটা।

লালনের দলটিকে দেখে সে ভুরু নাচিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, তোরা আবার কারা?

লালন বিনীত ভাবে বলল, হুজুর, আমরা হরিনাথের বন্ধু।

নায়েব বলল, বটে! সে তোমাকে পাঠাইছে? সে নিজে লুকাইয়া আছে কোথায়?

লালন বলল, সে আমাদের পাঠায় নাই। সে কোথায় আছে, তাও আমরা জানি না।

নায়েব বলল, সে তোদের পাঠায়নি? তবে তোরা এখানে মাথা গলাতে এসেছিস কেন? যা যা, নিজের কাজে যা।

লালন বলল, হরিনাথের কি খাজনা বাকি পড়েছে? তার তো নিজের জমি নাই। আমরা যতটুকু জানি, তার যেটুক ছিল, তাও সে ইস্কুল গড়ার জন্য দিয়ে দিয়েছে। তবু তারে ধরতে এসেছেন কেন?

কেন এসেছি, সেজন্য কি তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? তুই কে?

কৈফিয়ত না হুজুর। বন্ধুর বিপদ হলে অন্য বন্ধুরা পাশে এসে দাঁড়ায় না? বন্ধু কোনও দোষ করেছে নাকি, তাও জানতে চায়। আপনার বন্ধুর বিপদে আপনি তার পাশে যান না?

আমার কোনও বন্ধু নাই। জমিদারের কাজে বন্ধু-টন্ধু থাকলে চলে না। শোন, এই হরিনাথের একটা ছাতা-মাথা কাগজ আছে। তাতে জ্ঞানের কথা কিছু থাকে না। শুধু চুটকি খবর লেখে। তাতে লিখেছে যে, ঠাকুর জমিদাররা নাকি প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে, দুটো গ্রামের নাম দিয়ে লিখেছে, সেখানে প্রজাদের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, একজনকে মারতে মারতে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে। সব মিথ্যা কথা। লোকটার এত বড় আস্পর্ধা!

হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে পত্রিকার কথা লালন জানে। কিন্তু পড়তে তো পারে না। তাতে কী লেখা হয় সে জানে না। তবে বিনা কারণে হরিনাথ মিথ্যা কথা লিখবে, তাও বিশ্বাস হয় না। একবার হরিনাথ তাকে বলেছিল বটে, ঠাকুররা তাকে অপছন্দ করে।

নায়েব আবার বলল, ঠাকুর জমিদারদের সব লোক ধন্য ধন্য করে। অন্য জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জমিদার। সারা দেশে তাঁর সুনাম। আর তাঁর নামেই বদনাম দেয়, এই লোকটা এমন নিমকহারাম। এবার ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

লালন নানান জেলায় ঘুরে, বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েছে।

সে বলল, নায়েবমশাই, দেশে এখন ইংরেজ-রাজত্ব। আমরা সকলে মহারানি ইংলন্ডেশ্বরীর প্রজা। দেশে এখন আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুনেছি, এমনকী অত্যাচারী সাহেবদের নামেও আদালতে নালিশ করা যায়। আগেকার দিনের মতন জমিদারের তো শাস্তি দেওয়ার অধিকার নাই। হরিনাথ যদি মিথ্যা কথা লিখে থাকে, তা হলে আদালতেই তার বিচার হতে পারে।

নায়েব ফুঁসে উঠে বলল, ওরে বাপরে বাপ, এ যে দেখি ছোট মুখে বড় কথা! ছোটলোকরাও এই ইংরাজ রাজত্বে মাথায় চড়ে বসতে চায়। তুই আমাকে আইন শেখাতে এসেছিস, এই ক'টা তালপাতার সেপাই নিয়ে? ভাল চাস তো এখনই দূর হয়ে যা, নইলে তোদের সবক'টার লাশ ফেলে দেব এখানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লালন বলল, আমরা তো পিছু হঠতে আসি নাই। আমরা সব যদি লাশ হয়ে যাই, হইতেও পারি, কিন্তু তার আগে আপনাদেরও কয়েকজনের নির্ঘাত মাথা ফাটবে। দু'একটা লাশও পড়তে পারে। কেন শুধু শুধু এই রক্তারক্তি? তা বন্ধ করা যায় না? আদালতেই হরিনাথের বিচার হউক না!

নায়েব বলল, রক্তারক্তি হয় হোক। হরিনাথকে না নিয়ে যাব না।

তারপর সে হাঁক দিল, গুরমিত সিং!

এর মধ্যে জমিদারের লাঠিয়ালরা নায়েবের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের সকলেরই ঘি-খাওয়া মোটা সোটা চেহারা। একজন আছে পঞ্জাব দেশীয়, মাথায় পাগড়ি, এক হাতে লোহার বালা, কোমরে একটা ছুরি গোঁজা, দশাসই শরীর, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। তার হাতের লম্বা লাঠিটায় পিতলের আংটা লাগানো, পায়ে নাগরা।

সে ডাক শুনে সেলাম দিয়ে বলল, হুজৌর!

নায়েব হুকুম দিল, ই লোগোকে হঠা দেও!

জমিদারের লাঠিয়ালরা সবাই লাঠি আঁকড়ে ধরতেই লালন হাত তুলে বলল, দাঁড়াও, একটা কথা আছে। নায়েব মশাই, আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? শুনেছি, কোনও কোনও দেশে এই প্রথা আছে। সকলে মিলে মারামারি করে নিধন হওয়ার বদলে, দুই দলের একজন একজনের সঙ্গে লড়াই হোক। যে হারবে, তার দল বিদায় নেবে। ধরেন, আপনার দলের যে কোনও এক জনের সঙ্গে আমার দলের একজনের লড়াই হবে। আমার লোকটি যদি হারে, এমনকী মরেও যায়, তাহলে অন্যরা বিনাবাক্যে চলে যাবে। আপনারাও তাই মানবেন?

নায়েবের চক্ষু বিস্ময়ে প্রায় ছানাবড়া। সে বলল, তাই নাকি? এই প্রথা? বেশ কথা।

পঞ্জাবি লাঠিয়ালটির পিঠে হাত দিয়ে সে বলল, আমার দলের এর সঙ্গে তোমার দলের কে লড়বে?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লালন বলল, আমি।

জমিদারের লাঠিয়ালরা সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

লালনও হেসে বলল, ওর তুলনায় আমি চুনোপুঁটি। যদি আমার প্রাণ যায়, বন্ধুর জন্য প্রাণ দিলে সোজা স্বর্গে চলে যাব, তাই না? আপনাকে কিন্তু কথা রাখতে হবে।

লালন লাঠি নিয়ে তৈরি হতেই শীতল তার সামনে এসে বলল, সাঁই, তুমি স্বর্গে যেতে চাও, আমাদের বুঝি স্বর্গে লোভ নাই? তোমারে মোটেই আগে যেতে দেব না। তোমার থিকা আমি দুই বছরের বড়। বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই আগে যায় না।

লালন আরও কিছু বলতে গেলেও শীতল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আর কোনও কথা না। আমিই আগে।

লালন বলল, বেশ!

তারপর নিচু গলায় বলল, শোন, শীতল, লোকটারে বাগে পেলেও একেবারে মেরে ফেলিস না। হার স্বীকার করাতে পারলেই হবে।

শীতল বলল, ঠিক আছে, তোমার কথা মতন, ওরে প্রাণে মারব না, আমি মরি তো মরবো। তাই সই।

লালন বলল, তুই মরবি না। আমি তোর জন্য দোয়া করব।

শীতল বলল, সাঁই, অন্য এক জমিদার আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। পেয়াদারা আমার ভগিনীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, ঋণ শোধ করতে পারি নাই তাই জমিদার জুতা মেরেছিল আমার দুই গালে। তখন রুখে দাঁড়াতে পারি নাই, পালায়ে এসেছি গ্রাম ছেড়ে। আজ এক জমিদারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিলে আমি ধন্য হব। পূর্বপুরুষ আশীর্বাদ করবে।

লালন আবার বলল, তুই মরবি না, শীতল। আমার আয়ুর ভাগ তোরে দিলাম।

বাড়ির সামনের চাতালটা খালি করে দেওয়া হল। হরিনাথের বাড়ির লোক ভয়ার্ত চোখে দেখছে গবাক্ষ দিয়ে। আরও কিছু লোকের ভিড় জমেছে।

লুঙ্গিটা খুলে ফেলেছে শীতল, শুধু একটা নেংটি পরা। একেবারে মেদহীন, কালো চকচকে শরীর। সরু কোমর, চওড়া বুক, জ্বলজ্বল করছে চক্ষু যেন একটা কালো রঙের বাঘ।

গুরমিত সিং-এর কোনও প্রস্তুতির দরকার হল না। সে তো ধরেই নিয়েছে, এ লড়াই একটুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। প্রায় সব দর্শকদেরও তাই ধারণা।

গুরমিত সিং প্রথম থেকেই লাঠি উঁচিয়ে সবলে শীতলের মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। তার শরীরে যতই শক্তি থাক, লাঠি চালানোতে সে তেমন দক্ষ নয়। শীতল একটা উচ্চিংড়ের মতন তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে দৌড়তে লাগল ঘুরে ঘুরে। অপর পক্ষের লাঠি একবারও তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

অত সহজে যুদ্ধ শেষ হল না, বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে লাগল একই ভাবে। গুরুমিত মারতে তাড়া করে আর শীতল থামায়। দু'জনের লাঠিতে ঠোকাঠুকিও হল না একবারও।

ক্রমশ ভারি শরীর নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গুরমিত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বোঝা যায়। রাগে, বিরক্তিতে সে গর্জন করতে লাগল, শীতল একেবারে নিঃশব্দ। সে অতিরিক্ত একটুও শ্বাস নষ্ট করছে না।

তারপর একবার গুরুমিত শীতলের কাছে এসে পড়ল। এই বার বুঝি শেষ হল খেলা। সকলে দমবন্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

শীতলের মাথা লক্ষ করে প্রচণ্ড জোরে লাঠি চালাল গুরুমিত। একেবারে শেষ মুহূর্তে টুক করে সরে গেল শীতল। অত জোরে মাটিতে আঘাত করার ফলে গুরমিত আর লাঠি ধরে রাখতে পারল না, খসে গেল হাত থেকে। শীতল সঙ্গে সঙ্গে সেই লাঠিটায় এক লাথি মেরে পাঠিয়ে দিল অনেক দূরে।

তারপর নিজের লাঠি তুলে মারতে গেল গুরমিতের মাথায়।

জমিদারের লেঠেল বাহিনী আইস্যা হরিনাথের বাড়ি ঘেরছে।
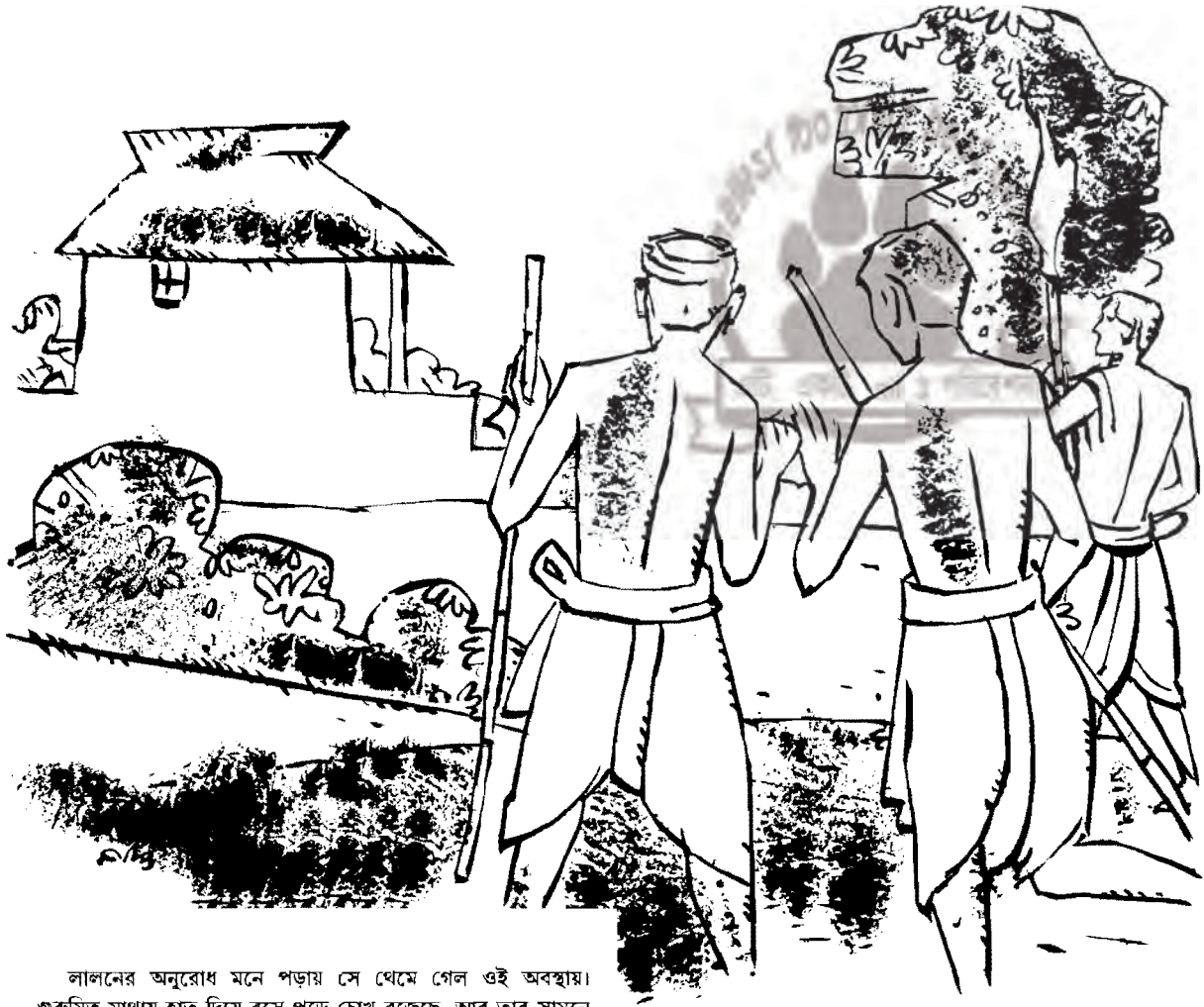
লালনের অনুরোধ মনে পড়ায় সে থেমে গেল ওই অবস্থায়। গুরুমিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে চোখ বুজেছে, আর তার সামনে যমদূতের মতন লাঠি তুলে আছে শীতল।

লালন এবার দৌড়ে মাঝখানে এসে বলল, সাবাস শীতল, সাবাস।

তারপর সবার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, আপনারাই বলুন, কে জিতেছে?

সবাই চিৎকার করে একবাক্যে সায় দিল শীতলের নামে।

জমিদারের অন্য লাঠিয়ালরা এবার তেড়ে যেতে চাইল লালনদের দিকে। নায়েব তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, না, থাক থাক। আমরা ভদ্রলোক, আমরা কথার খেলাপ করি না। আর লড়াই হবে না। চল, সবাই ফিরে চল।

লালনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, আজকের মতন শেষ হলেও এ খেলা এখানেই শেষ নয়। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এবারে হরিনাথের বাড়ির লোকজন হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল।

প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা কিংবা স্তুতিবাক্যে কান নেই লালনের। সে ফেরার জন্য ব্যস্ত। এই সব মারামারির সম্পর্কে সে আলোচনা করতেও চায় না বেশিক্ষণ।

হরিনাথ লুকিয়ে নেই, সে সত্যিই অনেক দূরের এক গ্রামে গেছে নৌকোয়, ফিরতে অধিক রাত হবার কথা। লালন আর অপেক্ষা করল না।

নায়েবের কথাই ঠিক। ঠিক সাতদিন পর সে ফিরে এল, এবারে একেবারে শিমুলতলার নয়া বসতিতে। সে এসেছে ঘোড়ায় চেপে, সঙ্গে দু'জন মাত্র রক্ষী, একজনের হাতে বন্দুক, অন্যজনের হাতে একটা বল্লম।

আজও শীতের দুপুর, একই রকম ভাবে শুয়ে-শুয়ে লালন অনেকের সঙ্গে আলাপচারি আর হাস্য পরিহাসে মেতে ছিল।

বড় গাছটার তলায় ঘোড়া থেকে নেমে সে লালনের দিকে তাকিয়ে বলল, সেদিন তুমি আইন-আদালত দেখাচ্ছিলে। হরিনাথ আমাদের প্রজা নয় ঠিকই। কিন্তু এই জঙ্গল ঠাকুর-জমিদারদের সম্পত্তি। তোমরা এখানে বিনা অনুমতিতে ঘর-বাড়ি তুলেছ। এর নিষ্পত্তি তো জমিদারই করবেন, তাই না? আমি কিছু বলব না। জমিদারবাবু তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, যা বলবার তিনিই বলবেন।

সবাই প্রথমে হতবুদ্ধির মতন এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। এখন কী করা যাবে? নায়েব মশাই বিরাট বাহিনী নিয়ে জোরজুলুম করতে আসেননি, শুধু লালনকে নিয়ে যেতে চাইছেন, এখনই কোনও সংঘর্ষের প্রশ্ন নেই।

কিন্তু লালনকে একা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? ওকে কয়েদ করে রাখবে? ওর ওপর অত্যাচার চালাবে? কোনও দলিলে জোর করে টিপ সই দেওয়াবে?

মনসুর নায়েবকে জিজ্ঞেস করল, লালন ভাই যদি না যেতে চায়, আপনে কি তারে জোর কইরা ধইরা নিয়া যাবেন?

নায়েব বলল, না, সেরকম কোনও হুকুম নাই। আমি শুধু জমিদারের হুকুম জানাতে এসেছি। যাওয়া-না যাওয়া তার ইচ্ছা। সে যদি না যেতে চায়, জমিদারকে জানাব। তারপর যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা তিনি

বুঝবেন।

লালন শান্ত ভাবে বলল, ঠিক আছে, আমি যাব।

তৎক্ষণাৎ শীতল চিৎকার করে বলে উঠল, আমিও সঙ্গে যাব। লালনকে আমরা একা ছাড়ব না।

আরও তিন-চারজন চেঁচিয়ে উঠল। আমরাও যাব। সবাই মিলে যাব। একটা কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

নায়েব হাত তুলে বলল, চুপ। চুপ। আর কারুর যাওয়ার হুকুম নাই। শুধু লালনকে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছে।

শীতল দর্পের সঙ্গে বলল, কেন, আমরা যেতে পারব না কেন?

নায়েব বলল, আবার লড়াই করতে যেতে চাস নাকি? একেবারে মুখ্যু, জানিস না, জমিদারের সামনে যখন তখন যাওয়া যায় না। ভাণ্ডারার সময় নজরানা নিয়ে গেলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

মনসুর জিজ্ঞেস করল, লালন ভাই কী নজরানা নিয়ে যাবে?

নায়েব বলল, লালনকে কিছু দিতে হবে না। ওকে তো জমিদার নিজে দেখা করতে বলেছেন।

লালন বলল, আপনে একটু অপেক্ষা করেন, আমি একবার ঘর থেকে আসি। পানি খাবেন? কমলি মুড়ির মোয়া বানাইছে না? মোয়া খাবেন?

নায়েব বলল, না কিছু খাব না। তোমাদের এদিকে হরিণ-টরিণ আসে নাকি? একটা হরিণ পেলে নিয়ে যেতাম।

মনসুর বলল, না, এদিকে হরিণ আসে না। মাঝে মাঝে খরগোশ দেখি। আর ময়ূর। আগে জানলে, আপনের জইন্য একটা ময়ূর ধইরে রাখতাম।

পেছন দিক থেকে একজন বলে উঠল, আপনেদের ওইদিকে যদি শিয়াল কম থাকে দুই-পাঁচটা নিয়া যেতে পারেন।

অনেকে হেসে উঠল।

এর পরেও একজন যোগ করল, আরে না, কর্তারা থাকেন শিয়ালদহে, সেহানে শিয়াল কম পড়বে ক্যান!

লালনের তো বিশেষ সাজগোজের বালাই নেই। সে ঘরে এলো গুপিযন্ত্রটা নেবার জন্য। অনেকটা পথ যেতে হবে। যদি মনে গান আসে, তাহলে এটা বাজানো যাবে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভানুমতী। চোখ দু'টি দেখলে যেন মনে হয় ফেটে বেরিয়ে আসবে।

একেবারে শরীরের অনেক গভীর থেকে স্বর বের করে সে বলল, আবার কি আমার কপাল পুড়ল? তুমি চল্লা?

লালন তার থুতনি ধরে বলল, হ যাচ্ছি, অত ভয়ের কী আছে? আমি আবার ফিরে আসব!

ভান্তি বলল, দিদিরা যে কইলো, তুমি আর আসবা না? আমার কপাল দেখেই কি তোমারে ধইরে নিয়ে যায়?

লালন তার গালে একটা টুসকি মেরে বলল, নারে পাগলি, তোর কপালের দোষ নাই। দোষ যদি কিছু থাকে, তা আমারই কপালের। তুই অপেক্ষা কইরা থাকিস, আমি ঠিকই ফিরা আসব।

গুপিযন্ত্রটা নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

কাছেই একটা আমলকি গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে কমলি। তার হাতে একটা চাদর। রাইখ্যো। অনেক দূরের পথ, শীত লাগবে।

লালন পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল কমলির দিকে।

কমলি মুখ নিচু করে বলল, সাঁই, আর কি দেখা হবে না?

লালন বলল, কেন দেখা হবে না? আমি তো একেবারে—

কমলি বলল, আমি তো আর কিছু পাবো না। শুধু তোমারে দূর থেকে দেখি, তা থিকা আমারে বঞ্চিত কোরো না—

আর কিছু না বলে সে দৌড়ে চলে গেল।

নায়েবরা ঘোড়ায় এসেছে, লালন ও তার ঘোড়া যাবে। হেঁটে যেতে গেলে সময় লেগে যাবে অনেক।

লালনের ঘোড়াটাও আনা হয়েছে। লালন চেপে বসবার পর শীতল বলল, সাবধানে যাইয়ো ওস্তাদ।

লালন বলল, তোরা সাবধানে থাকিস। আমার পানের বরজ দেখিস।

মনসুর নায়েবকে জিজ্ঞেস করল, কর্তা, আমাগো সাঁই করে নাগাদ ফিরতে পারবে?

নায়েব রহস্য করে বলল, সেটা জমিদার যা মনে করবেন। কিংবা—

আকাশের দিকে একটা আঙুল তুলে বলল, কিংবা উপরওয়ালার ইন্দা।

মানুষ তো সব সময় যুক্তি মেনে চলে না। এক এক সময় যুক্তিকে ছাড়িয়ে যায় আবেগ। লালনের ঘোড়াটা চলতে শুরু করতেই কয়েকজন বলল, আমরা যাব, আমরা যাবই যাব আমাগো লালনের সঙ্গে—দেহরক্ষী দু'জন এতক্ষণ প্রায় নীরব ও নিঃশব্দ ছিল, এবার তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের অস্ত্র তুলে বলল, আর কেউ যাবে না, আর কেউ যাবে না।

লালনও তাদের ধমক দিয়ে বলল, কেন এমন করোস তোরা? যা, ফিরা যা। মাইয়া মানুষরা কেউ কান্দে নাই, তোরা নাচ্ছোস, তোগো লজ্জা করে না? আমি কি চিরকালের মতন যাইতেছি নাকি!

ঘোড়াটা খানিকটা এগবার পর নায়েব রসিকতা করে বলল, তুমি লাঠিও ধরো, আবার গুপিযন্ত্রও বাজাতে পারো? আজ লাঠির বদলে ওই বাজনাটা আনলে কেন?

নায়েবের রসিকতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতন মন-মেজাজ লালনের নয় এখন। উত্তর দিল না সে, বাকি পথও ওদের সঙ্গে কথা বলল না।

তার মনের মধ্যে একটাই কথা ঘুরছে। জমিদার কি জঙ্গলের মধ্যে তাদের এই নতুন বসতি ভেঙে দিতে বলবেন? এতগুলি ছন্নছাড়া মানুষের নিবিড় সুখের সংসার আবার শেষ হয়ে যাবে? জমিদার যদি অনেক টাকা চান, তা হলেও তা দেওয়া যাবে কীভাবে? জমির মূল্য দেওয়ার ক্ষমতাও তো তাদের নেই।

এই চিন্তার জন্য লালনের মনে কোনও গান এলো না। গুপিযন্ত্রটা বাজাতে লাগল আস্তে আস্তে।

শিলাইদহ আসলে খুব দূরে নয়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি গেলে একটামাত্র ছোট নদী পার হতে হয়, সে নদীতে হাঁটুও ডোবে না এই শীতকালে। ওরা পৌঁছে গেল সন্ধের কাছাকাছি।

লালনের বুকের মধ্যে নানারকম আশঙ্কা গুড়গুড় করছিল ঠিকই। কিন্তু শিলাইদহের কুঠিবাড়ির একেবারে সামনে পৌঁছে হঠাৎ কী করে যেন সব কেটে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, এত ভয়ের কী আছে? জমিদারও মানুষ, সেও মানুষ। জমিদারের ক্ষমতা অনেক বেশি হতে পারে। কিন্তু সেও তো সব কিছু এক নিমেষে ছেড়ে চলে যেতে পারে। তাহলে জমিদার কী নেবে? সে ও তার সঙ্গীসাথীরা এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে অন্য জঙ্গলে। দুনিয়ায় কি জঙ্গলের অভাব আছে?

এই কথাটা ভাবার পরেই তার মনে বেশ বল এল।

কুঠিবাড়ির সদর দেউড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর তাকে ঘোড়া থেকে নামতে বলা হল। অন্য একজন লোক এসে এক কোণের একটি জায়গা দেখিয়ে বলল, তুমি ওইখানে বসে থাকো। নায়েব মশাইয়ের যখন সময় হবে, তখন তোমার সঙ্গে এসে কথা বলবেন।

অর্থাৎ যে টাকমাথা লোকটিকে নায়েব মনে করা হয়েছিল, সে নায়েব নয়। একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারি। আসল নায়েব থাকেন এখানে। এত সামান্য ব্যাপারে তিনি বাইরে যান না।

লালন বলল, আমি শুধু জমিদারবাবুর সাথে কথা কব, আর কারুর সাথে কথা কইতে চাই না।

কাছাকাছি দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারা হেসে উঠল।

একজন বলল, ওরে বাবা, এ কোন লাটসাহেব এল? জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওরে, নায়েবই যদি তোর সঙ্গে কথা বলেন তো বর্তে যাবি! নকুলবাবু তো কুমারখালির দিকটায় খাজনার ব্যাপার দেখেন। এখন ওই চাটায়ে বসে বিশ্রাম করো।

লালন তবু টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে জানালো যে, সে অন্য কোথাও যাবে না, বসবেও না। সে শুধু জমিদারের সঙ্গে কথা বলবে। যেন সে রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার প্রত্যাশা করে।

এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল, তারপর এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে গেল ভেতরে।

সেটা ঠিক অন্দরমহল নয়। একটুখানি ভেতরে ঢুকে আবার বাইরের দিকে এক প্রশস্ত বারান্দা। অদূরে নদী। ওপারে সূর্যাস্ত হচ্ছে।

সেই সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসে আছেন জমিদার। তাঁর সামনে একটা ইজেল, তাতে একটা অর্ধসমাপ্ত ছবি। ইজেলের নীচেও কয়েকটি ছবি পড়ে আছে মেঝেতে।

লালন অবশ্য ইজেল বস্তুটি কী তা বুঝল না।

অস্ত সূর্যকে প্রণাম করে জমিদার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন তার দিকে।

লালন এমন অবাক বহুদিন হয়নি। সে মনে মনে ভেবে এসেছে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবে। তিনি এক রাশভারি চেহারার প্রবীণ হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ যে এক নবীন যুবা। দীর্ঘকায়, অত্যন্ত রূপবান। দেবেন্দ্রনাথের পরিবর্তে তাঁর পুত্রদের কেউ যে এখন জমিদারি পরিদর্শনের ভার নিয়েছে, তা এ অঞ্চলে এখনও বিদিত নয়।

যুবকটি লালনকে সঙ্গে নিয়ে আসা কর্মচারিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

কর্মচারিটি বললেন, আজ্ঞে কর্তামশাই, এর নাম লালন ফকির। আপনি বলেছিলেন—

যুবকটি অত্যুৎসাহী হয়ে উঠে বলল, আপনিই লালন ফকির? বসুন, বসুন। ওরে, কেউ একটা কুর্সি এনে দে। আপনাকে কেন ডেকে এনেছি জানেন? আপনার দু'টি-একটি গান শুনব বলে।

লালন বলল, আপনি শুধু আমার গান শোনার জন্য আমাকে ডেকে এনেছেন?

যুবকটি বলল, হ্যাঁ, নানারকম গান সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ। তবে, এভাবে আপনাকে ডেকে আনা নিশ্চয়ই আমার বেয়াদপি হয়েছে। আমারই উচিত ছিল আপনার আখড়ায় গিয়ে গান শোনা। কিন্তু জানেন তো, জমিদাররা খাঁচায় বদ্ধ জীব। তারা ইচ্ছেমতন যেখানে সেখানে যেতে পারে না। আমি যদি আপনার আখড়ায় যেতে চাইতাম, সাতগন্ডা নায়েব গোমস্তা আর পাইক-পেয়াদা আমার পেছনে দৌড়ত। সেই জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।

লালন এবার হো হো করে হেসে উঠল।

সেই হাসি শুনে থতমত খেয়ে যুবক জমিদারটি জিজ্ঞেস করল, আপনি হাসছেন কেন?

লালন বলল, আপনি আমার গান শোনার জন্য ডেকেছেন। আর আমি ভাবতে ভাবতে এসেছি, আপনি আমায় শাস্তি দেবেন, কয়েদ করবেন, আমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করবেন।

খাঁটি বিস্ময়ের সঙ্গে সেই জমিদার জিজ্ঞেস করল, আপনাকে শাস্তি দেব... কেন?

লালন বলল, কয়েকদিন আগেই আপনার লাঠিয়ালদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়েছে। আমরা জঙ্গলে যে জমিতে—

যুবকটি বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান। লাঠিয়ালদের সঙ্গে সংঘর্ষ মানে... আপনারও লাঠিয়াল আছে নাকি?

সে গলা তুলে বলল, শচীনবাবু, শচীনবাবু! এই কে আছো, একবার শচীনবাবুকে ডাকো তো!

ভৃত্যরা এর মধ্যে দু'টি হ্যাজাক বাতি এনে রেখে গেল দু'দিকে। আর একটি সেজ বাতি। এত উজ্জ্বল আলোর বিলাতি হ্যাজাক বাতি লালন আগে দেখেনি।

যুবকটি একটা সাদা রঙের লম্বা ও গোল লাঠির মতন বস্তু ঠোঁটে লাগিয়ে গন্ধক কাঠি জ্বেলে সেটি ধরাল। ধোঁয়া বেরুতে লাগল তার থেকে। সিগারেট নামে এই শহুরে বস্তুটি এদিককার গ্রামাঞ্চলের তামাক-ধূমপায়ীদের কাছে এখনও অপরিচিত, অভিনব। যুবকটি এই সিগারেট সেবন শিখেছে মাইকেল মধুসূদন নামে এক ফিরিঙ্গি কবির কাছ থেকে।

ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করতে করতে যুবকটি বলল, শচীনবাবু আসুক, তার আগে আপনি বলুন তো, লাঠালাঠির বৃত্তান্তটা কী?

লালন বলল, আপনি কিছুই জানেন না?

যুবকটি বলল, এই তো প্রথম শুনছি।

লালন সংক্ষেপে ঘটনাটি জানাল। ততক্ষণে শচীনবাবু নামে এক ব্যক্তি এসে গেছেন। জমিদার-তনয় তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, শচীনবাবু, এসব কী শুনছি? এই হরিনাথ মজুমদার কে?

শচীন বলল, আজ্ঞে হরিনাথ মজুমদার একটা অতি নগণ্য পত্রিকার এডিটর। নিজেকে সে মাঝে মাঝে কাঙাল হরিনাথ বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। সে আমাদের এই জমিদারির নামে নানারকম মিথ্যা কুৎসা রটনা করে চলেছে। তাই তাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য...

লাঠিয়াল পাঠিয়ে দিলেন?

ভবদেব গোমস্তা কয়েকজন লাঠিয়াল নিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। তবে বিশেষ কিছু হয়নি। শুধু একটু ভয় দেখিয়ে—

বিশেষ কিছু হয়নি, তার কারণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ছি ছি ছি ছি! আপনারা কোন যুগে পড়ে আছেন? পত্রপত্রিকায় কিছু লিখলে কি সেইজন্য লাঠিয়াল পাঠানো যায়? এসব তো বর্বর যুগে হত। আপনাদের এখানে কেউ লেখাপড়া জানে না। লেখার জবাব লেখাতেই দিতে হয়। লাঠি দিয়ে নয়। আর যদি মিথ্যে কথা লিখেই থাকে, তাতে গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে?

লালন বলল, পুরাটা মিথ্যা না তাতে কিছু সত্যও আছে, তাও তো যাচাই করা দরকার।

জমিদার জিজ্ঞেস করল, কী লেখা হয়েছে সেই রিপোর্টে?

লালন তাকাল শচীনের দিকে। শচীন বলল, ওসব কথা আমি মুখে আনতেও চাই না।

জমিদার তাকাল লালনের দিকে।

লালন আস্তে আস্তে বলল, আমার অক্ষরজ্ঞান নাই, নিজে কিছু পড়তে পারি না। লোকমুখে শুনেছি, গ্রামের গরিব প্রজাদের ওপর লাঠিয়ালরা গিয়া অত্যাচার করে, খাজনা দিতে না পারলে চাষিদের বাড়িতে আগুন ধরায়ে দেয়, আর কুকর্মের বিবরণ... বাবুমশাই, ওই হরিনাথ মজুমদার আমার বন্ধু মানুষ, আমি তারে বিশ্বাস করি, সে গরিব মানুষের পক্ষে।

জমিদার বলল, হুঁ, এর মধ্যে কিছু কিছু সত্য থাকতেই পারে। নইলে শচীনবাবুরাই বা এত উত্তেজিত হবেন কেন? জমিদাররা থাকেন সব কলকাতায়, দূরের জমিদারিতে নায়েব-কর্মচারিরা যে কী করছে, তার খবরও রাখেন না। তাঁরা টাকা পেলেই খুশি। কীভাবে যে সেই টাকা আদায় হচ্ছে... নাঃ, এ রকম আর বেশিদিন চলতে পারে না। জমিদারি ব্যবস্থায় ঘুণ ধরে গেছে। লর্ড কর্নওয়ালিশের এই ব্যবস্থা আর বেশিদিন টিকবে না মনে হয়। এখন আমাদের ব্যবসা ছাড়া গতি নেই। আপনাদের ভিটেমাটির কী সমস্যা হয়েছে বলছিলেন?

লালন বলল, আমরা গুটিকতক মানুষ, আমারই মতন দরিদ্র, সমাজ থিকা বিতাড়িত, জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট কুটির বানিয়ে একটা বসতি গড়েছে। সেই জঙ্গল যে আপনাদের জমিদারির মধ্যে পড়ে তা জানতাম না। আমরা ভেবেছিলাম, বন-জঙ্গল, নদী, বিল-হাওর এই সবই সৃষ্টিকর্তার সম্পত্তি...

জমিদার হেসে বলল, সেটাই তো স্বাভাবিক। আমরা জমিদাররা জোর করে এসব ভাগাভাগি করে নিয়েছি। পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় এক ফোঁটাও জমি সৃষ্টিকর্তার অধীনে নেই।

লালনদের নতুন বসতির খুঁটিনাটি সে মন দিয়ে শুনল।

তারপর বলল, শচীনবাবু, এই ফকিরের যে-গ্রাম, তা সব নিষ্কর হিসেবে পাট্টা করে দিন। আমি থাকতে থাকতেই যেন সই-সাবুদ হয়ে যায়। দেখবেন যেন গাফিলতি না হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে সামনের ইজেলের অর্ধসমাপ্ত ছবিটা সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, আমার ঠাকুরদাদা ঈশ্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর এই এদিককার জমিদারির পত্তন করেছিলেন। তিনি ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। তখন আমাদের সম্পত্তি অনেক বিস্তৃত হয়েছিল। তারপর, আপনারা জানেন কি না জানি না, বিলাতে গিয়ে আমার ঠাকুরদাদা মশাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর দেখা যায় আমাদের প্রচুর ঋণ। আমার বাবামশাইকে তখন দেউলিয়া ঘোষণা করতে হয়েছিল। তারপর বাবামশাই ধীরে ধীরে সব পুনরুদ্ধার করেন, সব পাওনাদারদের ঋণ মিটিয়ে দেন। সেই সময় বাবামশাই নিয়মিত জমিদারি পরিদর্শনে আসতেন। কিন্তু তিনি তো নিছক জমিদার হয়ে থাকার জন্য জন্মাননি। তিনি এখন ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন। জমিদারির কিছু দেখেন না, কলকাতাতেও বিশেষ থাকেন না। মাঝেমাঝেই চলে যান সিমলে পাহাড়ে কিংবা গঙ্গায় বোটে থাকেন। জমিদারির ভার দিয়েছেন ছেলেদের ওপর। মুশকিল হচ্ছে, আমার বড়

দাদা দার্শনিক ও কবি মানুষ, বিষয়কর্মে একেবারেই মন নেই। পরের দাদা খুবই উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু তিনি জমিদারিতে আগ্রহ দেখাননি, সরকারি চাকরি করেন, এখন আছেন বোম্বাই নগরীতে। তারপর এই অধম... আপনি আমার নাম জানেন।

লালন বলল, আজ্ঞে না।

আমার নাম জ্যোতিরিন্দ্র। জমিদারি সামলাবার ব্যাপারে আমি একেবারেই অযোগ্য। সত্যি কথা বলতে কী, আমার ভাল লাগে গান-বাজনা, ছবি আঁকা, থিয়েটার। আমি শহুরে মানুষ। তাছাড়া জমিদারির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান বলে মন লাগাতেও পারি না। বরং সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি জাহাজের ব্যবসা করব ভাবছি। দেখা যাক।

আপনি কি নিজে গান করেন?

কেন, এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আপনার মতন এমন সুরেলা কণ্ঠ কোনও পুরুষের আগে শুনিনি।

জ্যোতিরিন্দ্র একটু লজ্জা পেয়ে বলল, আমাদের বাড়িতে গানবাজনার খুব চর্চা হয়। ভাইবোনেরা অনেকেই গান গায়। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি এই অঞ্চল ঘুরে গেছেন, তিনি কোথাও আপনার গান শুনেছেন, আপনার আর গগনের। ফিরে গিয়ে আমায় বললেন, গ্রামবাংলায় কত রত্ন যে ছড়িয়ে আছে, আমরা তার কিছুই সন্ধান রাখি না। বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতিকে তো আপনারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। এবার আমি এসেছি প্রধানত আপনাদের গান শোনার জন্যই। অনেক কথা হয়েছে, এবার গান ধরুন।

লালন গুপিযন্ত্রটায় সুর তুলতেই জ্যোতিরিন্দ্র আবার বলল, যদি কিছু মনে না করেন, এদিকে এই দু'টি বাতির মাঝখানে বসবেন?

ইজেলে একটা নতুন কাগজ পরিয়ে সে হাতে নিল স্কেচ পেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে একবার পেছন দিকে তাকাল।

জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে তার এক ছোট ভাই এসেছে। সে কিশোরবয়স্ক, তার নাম রবি।

জ্যোতিরিন্দ্র দু'বার রবি, রবি বলে ডেকে জিজ্ঞেস করল, রবি কোথায় গেল?

একজন কর্মচারি জানাল, রবি নদীর চড়ায় বালিহাঁস দেখতে গিয়েছিল এখনও ফেরেনি।

জ্যোতিরিন্দ্র বলল, থাক। ফকির সাহেব, আপনার গান শুরু করুন।

এবার লালন গান ধরল, এ তার স্বতঃস্ফূর্ত গান নয়, পুরনো রচনা, গনাই শেখের কাছে নতুন করে শোনা।

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনম-ভর মেলে না।

খুঁজি তারে আসমান-জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ কী বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোন জন সে কোন জনা।

রাম কি রহিম সে কোন জন
ক্ষিতি জল কি বায়ু-হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।

হাতের কাছে হয় না খবর
কী দেখতে যাও দিল্লি-লাহোর
সিরাজ সাঁই নয় লালন রে তোর
সাদায় মনের ঘোর গেল না

খুব দ্রুত লালনের প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে জ্যোতিরিন্দ্র বলল, অপূর্ব! আর একখানা—লালন আবার ধরল:

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা এক পড়শি বসত করে...

পরপর পাঁচখানি গান শুনিয়ে লালন থামল। পাশে সরিয়ে রাখল গুপিযন্ত্র।

জ্যোতিরিন্দ্র বলল, জঙ্গলের মধ্যে আপনাদের যে-গ্রাম, সেখানে আমার জন্য একটুখানি জায়গা রাখবেন। হয়তো একদিন একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বেঁধে আমিও সেখানে বাস করব। কী গান শোনালেন ফকির! এর সব মর্ম বোঝা সহজ নয়। 'আরশিনগর', এমন কখনও শুনিনি।

দ্রুত হাতে কয়েকটা টান দিয়ে রেখাচিত্রটি সম্পূর্ণ করে জ্যোতিরিন্দ্র বলল, এই দিকে এসে দেখুন তো, আপনার মুখখানি ঠিক হয়েছে কি না।

লালন উঠে এসে জ্যোতিরিন্দ্রের পাশে দাঁড়াল। ছবিটি দেখার পর হাসি ছড়িয়ে গেল তার সারা মুখে।

সে বলল, বাবুমশাই, আমার মুখখানি কেমন দেখতে, তা তো আমি জানি না। কখনও দেখি নাই।

জ্যোতিরিন্দ্র বলল, সে কী? নিজের মুখ কখনও দেখেননি? এই যে গাইলেন আরশি নগরের কথা?

লালন বলল, সে আরশি নগরে নিজেকেও দেখা যায় না, পড়শিকেও দেখা যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্র বলল, নার্সিসাস নামে একজন স্বচ্ছ ঝরনার জলে প্রথম নিজের মুখ দেখেছিল। আপনি তাও দেখেননি?

লালন বলল, এদিকে তেমন ঝরনা কিংবা নদী কোথায়? সবই তো ঘোলা জল!

জ্যোতিরিন্দ্র গভীর বিস্ময়ে বলল, এমন মানুষও আছে, যে জীবনে কখনও নিজের মুখও দেখেনি!

লালন বলল, গ্রামে-গঞ্জে এমন অনেক মানুষ আছে!

জ্যোতিরিন্দ্র একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, কোনও মেয়ের চোখের মণির দিকে খুব মন দিয়ে দেখলে সেখানে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তেমন দেখার চেষ্টা করেছেন?

লালন আরও হেসে বলল, এবার দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু বাবুমশাই, মুখখানা বেশি বুড়া বুড়া মনে হয়। আমি কি অত বুড়া হয়েছি?

জ্যোতিরিন্দ্র বলল, হ্যাঁ, ঠিক হয়নি। আলো কম লেগেছে। দিনের বেলা আরও ভাল করে আঁকতে হবে।

আর কিছু কথার পর লালনের বিদায় নেবার পালা। অন্তরালে একজন ভৃত্য একটি বোতল ও গেলাস নিয়ে অপেক্ষা করছে। এখন বাবুমশাইয়ের কারণ-বারি পান করার সময়।

জ্যোতিরিন্দ্র লালনকে অতিথিশালায় থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, লালন রাজি হল না। সে জানে শিমুলতলায় তার সঙ্গীসাথীরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। তাদের সুসংবাদ জানাবার জন্য এই রাতেই যতখানি সম্ভব সে এগিয়ে যেতে চায়।

কুঠিবাড়ির গেটের বাইরে আসতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে একজন ব্যক্তি লালনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, সাঁই, আপনি আমারে চেনেন না। আমি আপনার একজন ভক্ত-শিষ্য। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমার নাম গগন।

লালন বলল, তুমিই গগন! তোমার কথা একটু আগে শুনলাম। তুমি গান করো?

গগন বলল, আমি গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করি। লোকে আমায় বলে গগন হরকরা। মাঝে মাঝে গান মনে আসে, আপন মনে গাই। নিকটেই আমার কুটির, একবার পদধূলি দিলে ধন্য হই।

গগনের বাড়ির কাছে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক রমণী। সাধারণ নারীদের তুলনায় বেশ লম্বা ও চওড়া, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, কপালে একটা মস্ত বড় লাল টিপ। হাতে একটা একতারা।

গগন জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই কী করছিস এখানে?

স্ত্রীলোকটি বলল, আমিও তো এই ফকিরকে দেখব বলে অপেক্ষা করছি।

গগন বলল, সাঁই, এর নাম সর্বক্ষেপি। সকলে এই নামে ওরে ডাকে। ক্ষেপিই বটে, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়, কোনও ভয়-ডর নাই। এও নিজের গান গায়।

সর্বক্ষেপী বলল, ভয়-ডর আবার কিসের? জগৎ জুড়ে রয়েছে ভালবাসা।

গগন তার কুঁড়েঘরে একলাই থাকে। অতিথিদের জন্য সে একটা মাদুর পেতে দিল।

লালন একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, দাঁড়াও, আগে ভিতরের প্রাণীটাকে শান্ত করি। জমিদারের সামনে বিড়ি ধরাবার সাহস হয় নাই। উনি একটা লম্বা, সাদা রঙের বিড়ি টানছিলেন।

এক গেলাস জল এক চুমুকে শেষ করে লালন বলল, বেশি সময় নাই, যেতে হবে। গগন, তোমার একখান গান শোনাও।

গগন গান ধরল:

আমি কোথায় পাবো তারে। আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দিশে, দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে
লাগি সেই হৃদয় শশী, সদা প্রাণ হয় উদাসী...

দীর্ঘ গানটি শুনে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল লালন।

গগন আবার একটি ধরল:

হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে দেখো
এগলা নিতাই
এগলা নিতাই, এগলা নিতাই, এগলা নিতাই...

এ গানেরও সুর অপূর্ব।

গগন বলল, সাঁই, আপনারে আমার সামান্য গান শুনায়ে ধইন্য হইলাম। এবার আপনি যদি—

গগনকে তার কথা শেষ করতে হল না। আর অনুরোধও করতে হল না। লালন সিধে হয়ে বসল। তার চক্ষু দু'টি স্থির। সে শুরু করল গান:

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে...

এ গান পূর্বে রচিত নয়। স্বতঃস্ফূর্ত। জমিদার তনয়টি বেশ ভালই ব্যবহার করেছেন ঠিকই, তবু কেমন যেন বাধো বাধো লাগছিল। মনে হচ্ছিল উনি দূরের ভাষায় কথা বলেন। তাই মনে কোনও নতুন গান আসেনি।

এ গানটি শেষ হতেই লালন অন্য একটি গান শুরু করল। এও নতুন। এখন তার মনের মধ্যে পোনামাছের বাচ্চার ঝাঁক এসে গেছে।

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়...

লালন থামতেই সর্বক্ষেপি বলল, এখন আমি একটা গান শুনাই?

অত বড় চেহারার রমণীটি গান গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নেচে নেচে, মাথার ওপর দু'হাত তুলে তালি দেয়।

সে গাইল:

দেখে যা ও ময়ূরী, ও কোকিলা
আমার এই শূন্য ঘরে ভালোবাসার লীলা...

লালন ভেবেছিল, সে বেশিক্ষণ বসবে না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে। কোথায় কী? খাওয়াদাওয়ার নাম নেই, ধন-সম্পদের চিন্তা নেই, ভবিষ্যতে কী হবে তার ঠিক নেই, শুধু গান নিয়ে মেতে রইল এই তিনজন। অবিরাম গান, অবিরাম সুর, তারই কী তীব্র নেশা।

এক সময় বাইরে থেকে ভেসে এল আজানের সুর। তখন ওদের ঘোর ভাঙল। রাত্রি শেষ, ভোর হয়ে গেছে। ফুটে উঠছে আলো।

লেখকের বক্তব্য

এই উপন্যাসটি লালন ফকিরের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক জীবনকাহিনি হিসেবে একেবারেই গণ্য করা যাবে না। কারণ তাঁর জীবনের ইতিহাস ও তথ্য খুব সামান্যই পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে আর নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। জীবিতকালে লালন তাঁর অনুগত সঙ্গী-সাথী ও অনুগামীদের বাইরে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না। তাঁর গান আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লেও মানুষটাকে জানা যায়নি। লালন নিজেও ছিলেন পুরোপুরি প্রচার-বিমুখ এবং সেটা তাঁর জীবন-দর্শনেরও অঙ্গ।

লালনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরই কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকায় 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে একটি নিবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই পত্রিকায় কোনও রচনাতেই লেখকের নাম থাকত না। পত্রিকাটির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন পরবর্তীকালের প্রখ্যাত লেখক মীর মোশাররফ হোসেন এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন রাইচরণ দাস নামে এক উকিল। রচনাটি খুব সম্ভবত রাইচরণ দাসেরই লেখা, কেন না, মীরসাহেব তখন কুষ্টিয়ায় উপস্থিত ছিলেন না এবং তাঁর ভাষাও ঠিক এরকম নয়।

নিবন্ধকার লালনকে স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবি করলেও লিখেছেন যে, 'ইহার জীবনী লিখিবার কোনও উপকরণ পাওয়া কঠিন।' ওঁর শিষ্যরাও কিছু বলতে চাননি। কিছু কিছু লোকশ্রুতি অনুযায়ী, একটি জীবনীর খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। তা এই রকম: কুষ্টিয়ারই কোনও গ্রামে লালনের জন্ম এক কায়স্থ পরিবারে, শৈশবেই পিতৃহীন, অল্প বয়েসেই বিবাহিত। বিধবা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সামান্য অবস্থায় দিনাতিপাত করতেন। একসময় একটি দলের সঙ্গে জুটে গিয়ে লালন গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করার জন্য বহরমপুরে যান এবং ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেয়। কিন্তু তখন লালনের মৃত্যু হয়নি, জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁকে এক মুসলমান রমণী সেবাশুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। এই মহীয়সী রমণীর নামের উল্লেখ নেই কোথাও। লালন বেশ কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে আসেন, কিন্তু মুসলমানের গৃহে অন্নগ্রহণ করেছেন বলে হিন্দুধর্মচ্যুত হয়েছেন, গ্রামবাসীরা এই অভিমত দেয়। তাঁর মা এবং স্ত্রীও তাঁকে মুক্তমনে গ্রহণ করতে পারেননি। তখন ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লালন ইহকালের মতো গৃহত্যাগ করেন।

লালন লেখাপড়া শেখেননি, অক্ষরজ্ঞানও ছিল না, কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় ইসলাম, হিন্দু ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। এবং অনেকাংশে ছিলেন সুফিদের সঙ্গে সহমত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান রচনারও বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তাঁর। লালন ধার্মিক ছিলেন কিন্তু কোনও বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন জীবনে। এই জন্য গোঁড়া হিন্দু এবং শরিয়তপন্থী মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই চক্ষুশূল হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর এবং নিপীড়িত অনেক মানুষই লালনের অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের কোনও বিভেদ ছিল না। নিবন্ধকারের মতে, এই অনুগামীদের সংখ্যা লালনের জীবৎকালের মধ্যেই হয়েছিল অন্তত দশ হাজার।

আত্মানুসন্ধান এবং মনের মানুষকে খোঁজা এবং ঈশ্বর বা আল্লার সঙ্গে ভয় বা ভক্তির বদলে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ধারা আমাদের সাহিত্যে ও দর্শনে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। লালন তারই একজন সার্থক উত্তরসূরি। লালনের কোনও উপদেশ বা বাণী কোথাও লিপিবদ্ধ নেই, সম্ভবত তিনি তা বিশ্বাসও করতেন না। তাঁর গানেই তাঁর জীবন-দর্শন প্রতিফলিত। শোনা যায়, তিনি প্রায় এক হাজার গান রচনা করে মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সবগুলিরই মৌলিকত্ব প্রমাণ করার উপায় নেই। কিছু কিছু গানে পুনরুক্তি আছে এবং আমার মতে, তিনি রামপ্রসাদী গানের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। নদীয়ার শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণব পদাবলি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন।

শোনা যায়, লালনের মৃত্যু হয়েছিল ১১৬ বছর বয়সে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর। বয়সের হিসাবটা কী করে ধরা হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। নিরক্ষর, দরিদ্র পরিবারে ঠিকঠাক বয়সের হিসেব রাখার কোনও প্রথাই তখন ছিল না। তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন, তা বলা যায়। কিন্তু যখন লেখা হয়, মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস আগেও তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেন, তখন মনে প্রশ্ন জাগে, বয়সটা সত্যি না ঘোড়াটা সত্যি? লালনকে সাঁই, ফকির এবং বাউল বলে অভিহিত করা হয়, এর তিনটিই সত্যি এবং একথাও ঠিক, তিনি গৃহস্থ সংসারী ছিলেন। তাঁর বিষয়াসক্তি ছিল না, তবে মৃত্যুকালে তিনি দু'হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তৎকালে তা খুব কম নয়।

আমার এই উপন্যাসে, প্রকৃত তথ্যের স্বল্পতায় অনেক কাল্পনিক চরিত্র আনতে হয়েছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র, যেমন হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ নামে সমধিক পরিচিত), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন হরকরা প্রমুখ কয়েকজনের কথা থাকলেও ঠিক ঠিক সময়সীমা মানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উৎসাহেই লালনের গান বাংলার শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে অনেকখানি পরিচিত হয়। কিন্তু লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কখনও প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয় হয়নি, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত। তাই চরিত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আনা যায়নি। লালনের গানের একটি লিখিত সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গিয়ে আর

ফেরত দেননি, এমন একটা কথা প্রচারিত আছে। এসব কথা পরস্পর-বিরোধী মতামতে ভরা এবং গুজব, তা আর আলোচনার যোগ্যই নয়। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানে মুগ্ধ ছিলেন, তাঁর রচনায় কিছু কিছু বাউল গানের প্রভাবও পড়েছে। নিজেকেও তিনি বাউল মনে করতেন, এসব তো আমরা জানিই। দুদ্দু শাহ নামে লালনের এক শিষ্য রচিত জীবনীতে লালনকে জন্মাবধি মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। ঢাকা এবং কলকাতার গবেষকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, সে বইটি জাল। তাই উপন্যাসে সেই মত গ্রহণ করারও প্রশ্ন ওঠে না। লালনের জীবনের মূল ভাব ও আদর্শ ফুটিয়ে তোলাই আমার এই রচনার উদ্দেশ্য। কাহিনিটি আধার মাত্র। আর একটি কথাও উল্লেখ করা উচিত। সেকালের কুষ্টিয়া জেলার মানুষের মুখের ভাষা আমি সংলাপে ব্যবহার করিনি। তা আমার অসাধ্যও বটে। কোথাও কোথাও সামান্য আভাস দিয়েছি মাত্র।

প্রখ্যাত লালন-বিশেষজ্ঞ এবং লোক-সাহিত্যের গবেষক ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী একসময় ঢাকায় আমাকে তাঁর 'লালন সাঁইয়ের সন্ধানে' বইটি উপহার দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, লালনের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাসের কথা ভাবতে পারেন না? বস্তুত লালন ও হাসন রাজাকে নিয়ে কাহিনি নির্মাণের কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে। কিছু পড়াশুনোও করেছি। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে আমার অপারগতার জন্য ভয় পেয়েছি। হঠাৎ মনে হল, মূল বাংলা ভাষায় লিখলেই বা ক্ষতি কী? তবু দ্বিধা কিংবা সংশয় থেকেই যায়। উপন্যাসটির অনেকটা অংশই রচনা করেছি প্রবাসে। তখন নিউ ইয়র্কের সৈয়দ শহীদ আমাকে লালন সংগীতের অনেকগুলি সিডি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। লেখার সময় গানগুলি অনবরত কানের কাছে বাজত। আবুল আহসান চৌধুরী এবং সৈয়দ শহীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। —

বেশ কিছু জায়গাতেই আমি লালন কিংবা সিরাজ সাঁই-এর সংলাপ নিজে বানাইনি। লালনের গান থেকেই যথাসাধ্য ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করেছি। গল্পের গতি ব্যাহত হয় বলেই পুরো গান উদ্ধৃত করিনি। সেই জন্যেই, পরিশিষ্টে আমি লালনের গানের একটি নির্বাচিত সংকলন যোগ করার প্রয়োজন বোধ করেছি। কেউ যদি লালনের জীবন-দর্শন এবং তাঁর সমসাময়িক কাল সম্পর্কে আরও বেশি জানতে আগ্রহী হন, তাই কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থের নামও যুক্ত করা হল।

লালনের নির্বাচিত পদাবলি

১

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়॥

আট-কুঠরি নয়-দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপরে সদর-কোঠা
আয়নামহল তায়॥

কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার
কোন বনে পালায়॥

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তার কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়॥

২

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা এক পড়শি বসত করে॥

গেরাম-বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী
পারে।

মনে বাঞ্ছা করি
দেখবো তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে॥

বলবো কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাই রে।

ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥

পড়শি যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা যেতো
দূরে।

আবার, সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

৩

এ দেশেতে এই সুখ হল আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি॥

কার বা আমি কেবা আমার
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি॥

আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বহিয়ে পাপের তরণী॥

কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজনগুণে
লালন বলে কতদিনে
পাব সাঁইয়ের চরণ দু'খানি॥

৪

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না।
নড়েচড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনম-ভর মেলে না॥

খুঁজি তারে আসমান-জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ কি বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোনজন সে কোনজনা॥

রাম কি রহিম সে কোনজন
ক্ষিতি-জল কি বায়ু-হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না॥

হাতের কাছে হয় না খবর
কী দেখতে যাও দিল্লি-লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদাই মনের ঘোর গেল না॥

৫

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়া সে ধন দেখবো চক্ষেতে॥

আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা-দেনা
আমি হইলাম জনম-কানা
না পাই দেখিতে॥

রাজি হলে দারোয়ানি
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কই চিনি-শুনি

বেড়াই কুপথে॥

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে॥

৬

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা॥

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখ না।
আমি ঢাকা-দিল্লি হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না॥

সে তো আত্মারূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লখনা॥
আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ
লও না।
ফকির লালন বলে মনের ঘোরে
হলাম চোখ থাকিতে কানা॥

৭

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে॥

ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনী চিনি কীসে রে॥

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে॥

গর্তে গেলে কূপজল হয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল কয়
মূলে একজন, সে যে ভিন্ন নয়
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে॥

জগৎ-বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা-তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ-বাজারে॥

৮

সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান॥

একই ঘাটে আসা-যাওয়া
একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
ভিন্ন জল কে কোথা পান॥

বেদ-পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
এ ভেদ আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি কি তার প্রমাণ॥

বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতে যার নাই সেও তো বাওনী
বোঝরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি জাত একখান॥

৯

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে॥

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥

কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছ এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে॥

এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাই তো মানুষ-রূপ গঠলেন নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে॥

১০

মন আমার কী ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখ না রে সব হাওয়ার খেলা বন্ধ হতে দেরি কি হবে॥

থাকতে হাওয়া হাওয়াখানা

মওলা বলে ডাক রসনা
মহাকাল বসেছে রানায়
কখন জানি কু ঘটাবে॥

বন্ধু হলে এই হাওয়াটি
মাটির দেহ হবে মাটি
দেখে শুনে হও না খাঁটি
কে তোরে কত বুঝাবে॥

ভবে আসার আগে তখন
বলেছিলে করব সাধন
লালন বলে সে কথা মন
ভুলেছ এই ভবের লোভে॥

১১

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর পাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়॥

আমি সত্য না হইলে
হয় গুরু সত্য কোন কালে
আমি যেরূপ দেখ না সেরূপ দীন দয়াময়॥

আত্মারূপে সেই অধর
সঙ্গী অংশ কলা তার
ভেদ না জেনে বনে বনে ফিরলে কি হয়॥

আপনারে আপনি না চিনে
ঘুরবি কত ভুবনে
লালন বলে অন্তিমকালে নাই রে উপায়॥

১২

অমর্ত্যের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে।
বলব কি ফাঁদের কথা
কাক মারিতে কামান পাতা
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-নর-নারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে॥

পাতিয়ে ফাঁদের চুয়া
সে ব্যাধ বেটা দিচ্ছে খেয়া
লোভের চার খাটিয়ে।
চার খাবার আশে
পড়ে সেই বিষম পাশে
কত লোভী-কামী মারা যেতেছে॥

জেন্তে মরে খেলে যারা
ফাঁদ ছিঁড়িয়ে যাবে তারা
সিরাজ সাঁই কয় ওরে লালন
মনে রাখিস আসল বচন
জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদ তুই এড়াবি কিসে॥

১৩

কে তোমারে এ বেশ-ভূষণ পরাইলে বলো শুনি।
জিন্দা দেহে মরার বসন খিলকা-তাজ আর ডোর-কোপিনী॥

জিন্দা-মরার পোশাক পরা
আপন ছুরাত আপনি সারা
ভবলোককে ধ্বংস করা
দেখি অসম্ভব করণি॥

যে মরণের আগে মরে
শমনে ছোঁবে না তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনী॥

সেজেছ সাজ ভালোই তরো
মরি যদি বাঁচতে পারো
লালন বলে যদি ফেরো
দুকূল হবে অপমানি॥

১৪

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি॥

এই মানুষে মানুষ গাঁথা
গাছে যেমন আলেক-লতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
ও মন যাতে তরবি॥
দ্বিদলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজলে
মানুষগুরু নিষ্ঠা হলে
তবে জানতে পাবি॥

এই মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই শূন্যাকার
লালন বলে মানুষ আকার
ভজলে তারে পাবি॥

১৫

সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জেনেছে রসপান্তি সেই দেখিতে পায় অনা'সে॥

তিনশো ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মাঝে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে॥

মাতাপিতার নাই ঠিকানা
অচিন দেশে বসতখানা

আজগুবি তার আওনা-যাওনা
কারণ-বারির যোগ-বিশেষে॥

অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখিতে যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে থেকো সদায়
ত্রিপিনের ঘাটে বসে॥

১৬

মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সেকি অন্য তত্ত্ব মানে॥

মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবে সব দেবাদেবী
ভোলে না সে অন্যরূপী
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে॥

নরই সরই নূলা ঝুলা
পেঁচোপেচী আলাভোলা
তাতে নয় সে ভোলনেওয়ালা
যেজন মানুষ রতন চেনে॥

ফেয়ো-ফেঁপি ফ্যাকসা যারা
ভাকা-ভোকায় ভোলে তারা
লালন তেমনি চটা-মারা
ঠিক দাঁড়ায় না একখানে॥

১৭

আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা সেকি জপে মালা।
অতি নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা॥

কাছে রয় ডাকে তারে, উচ্চৈঃস্বরে
কোন পাগেলা।
ও রে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাক রে ভোলা॥

যার যেখানে বাথা নেহাত সেইখানে হাত
ডলামলা।

তেমনি যেন মনের মানুষ
মনে তোলা॥

যে জন্য দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ
রয় নিরালা।
লালন ভেঁড়ার লোক জানানো
মুখে হরি হরি বলা।

১৮

কেন সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবি রে ভাই মনা॥

ত্রিবেণীর তীর-ধারে
মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে
উপর উপর বেড়াও ঘুরে
গভীরে কেন ডুবলে না॥

মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নিরস হইতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সেই যোগের নির্ণয়
মীনরূপ খেলা দেখলে না॥
জগৎ জোড়া মীন-অবতার
মর্ম আছে ছন্দির উপর
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
সন্ধানীকে চিনলে না॥

১৯

আয় হারালি আমাবতী না মেনে।
ও তোর হয় না সবুর একদিনে॥

একেতে আমাবতীর বার
মাটি রসে সরোবর
সাধু-গুরু-বৈষ্ণব তিনে
উদয় সে রসের সনে॥

ও তুই খুতমা চাষা ভাই
তোর জ্ঞান কিছুই নাই
অমাবস্যায় হাল চালিয়ে
কাল হও কেনে॥

যে জন রসিক চাষা হয়
জমির জো বুঝে হাল বয়
লালন ফকির পায় না ফিকির
হাপুড় হুপুড় ভুঁই বোনে॥

২০

কে বানালো এমন রঙমহল খানা।
হাওয়া দমে দেখ তারে আসল বেনা॥

বিনা তেলে জ্বলে বাতি
দেখতে দেখতে মুক্তামতি
জলময় তার চতুর্ভিতি
মধ্যে থানা॥

তিল পরিমাণ জায়গা সে যে
হদ্দরূপ তাহার মাঝে
কালায় শোনে আঁধলায় দেখে
ন্যাংড়ার নাচন॥

যে গড়েছে এ রঙমহল
না জানি তার রূপটি কেমন
সিরাজ সাঁই কয় নাই রে লালন
তার তুলনা॥

২১

সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়।
হৃদকমলে ভাব দাঁড়ালে অজান খবর আপনি হয়॥

দুগ্ধে বারি মিশাইলে
বেছে খায় রাজহংস হলে
কারও যদি হয় সাধন বলে
হয় সে রাজহংসের ন্যায়॥

এই মানুষে মানুষ বিহার
মানুষ ধরে নিষ্ঠা হয় যার
সেকি বেড়ায় দেশ-দেশান্তর
পিঁড়েয় পেঁড়োর খবর পায়॥

পাথরে যেমন অগ্নি থাকে
বের করে নেয় ঠুকনি ঠুকে
সিরাজ সাঁই দেয় অমনি শিক্ষে
বোকা লালন সঙ নাচায়॥

২২

অন্ধকারের আগে ছিল সাঁই রাগে
আলকারেতে ছিল আলের উপর।
ঝরেছিল একবিন্দু হইল গভীর সিন্ধু
ভাসিল দীনবন্ধু নয় লাখ বৎসর॥

অন্ধকার ধন্দকার নিরাকার বৃত্তাকার
তারপরে হল হুহুংকার
হুহুংকারের শব্দ হল, ফেনারূপ হইয়া গেল
নীর-গভীরে সাঁই ভাসলেন নিরন্তর॥

হুহুংকারে ঝংকার মেরে দীপ্তকার হয় তারপরে
ধন্ধ দোরে ছিলেন পরওয়ার
ছিলেন সাঁই রাগের পরে, সুরাগে আশ্রয় করে
তখন কুদরতিতে করিল নিহার।
যখন কুণ্ডকারে কুণ্ড ঝরে বাম অঙ্গ ঘর্ষণ করে
তাইতে হইল মেঘের আকার
মেঘের রক্ত বিচে শব্দ হল, ডিম্ব তুলে কোলে নিল
ফকির লালন বলে লীলা চমৎকার॥

২৩

দিল-দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।
ডুবলে পরে রতন পাবে ভাসলে পরে পাবে না॥

দেহের মাঝে বাড়ি আছে
সেই বাড়িতে চোর লেগেছে
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে
চুরি করে একজনা॥

দেহের মাঝে নদী আছে
সেই নদীতে নৌকা চলছে
ছয়জনাতে গুণ টানিছে
হাল ধরেছে একজনা॥

দেহের মাঝে বাগান আছে
নানা জাতের ফুল ফুটেছে
সৌরভে জগৎ মেতেছে
লালনের প্রাণ মাতল না॥

২৪

যেখানে সাঁইর বারামখানা।
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে দেখতে যেমন ভুজঙ্গনা॥

যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি
বুঝেও না বুঝতে নারি
কীর্তিকর্মার কী কারখানা॥

আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সে-ই হয়েছে
কু-বৃক্ষে সু-ফল পেয়েছে
আমার মনের ঘোর গেল না॥
যে ধনে উৎপত্তি প্রাণধন
সেই ধনের হল না যতন
অকালের ফল পাকায় লালন
দেখে শুনে জ্ঞান হল না॥

২৫

মিলন হবে কতদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে॥

চাতক-প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছে কালো শশী
হব বলে চরণদাসী
ও তা হয় না কপাল গুণে॥

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারায়ে তেমন
ঐরূপ হেরি এ দর্পণে॥

ওই রূপ যখন স্মরণ হয়
থাকে না লোকলজ্জার ভয়

লালন ফকির কেঁদে বলে সদাই
ও প্রেম যে করে সে জানে॥

২৬

এমন দিন কি হবে রে আর।
খোদা সেই করে গেল রসুল রূপে অবতার॥

আদমের রুহু সেই
কেতাবে শুনিলাম তাই
নিষ্ঠা যার হল রে ভাই
মানুষ মুর্শিদ করল সার॥

খোদ ছুরাতে পয়দা আদম
এও জানা যায় অতি মরম
আকার নাই তার ছুরাত কেমন
লোকে বলবে তাও আবার॥

আহম্মদের নাম লেখিতে
মিম হরফ কয় নফি করতে
সিরাজ সাঁই হয় লালন তাতে
কিঞ্চিৎ নজর দেখ এবার॥

২৭

আগে কপাট মার কামের ঘরে।
মানুষ ঝলক দিবে রূপ নিহারে॥

হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর
যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পার
মরণের আগে মর
শমন যাক ফিরে॥

বারে বারে করি রে মানা
লীলার বশে বাস কর না
রেখ তেজের ঘর তেজিয়ানা
ঊর্দ্ধ চাঁদ ধরে॥

জান না মন পারাহীন দর্পণ
সে কি পাবে রূপ দরশন
বিনয় করে বলছে লালন
থেকো হুঁশিয়ারে॥

২৮

দিনে দিনে হল আমার দিন আখেরি।
আমি ছিলাম কোথা এলাম কোথা
আবার যাব কোথা ভেবে মরি॥

বাল্যকাল খেলায় গেল
যৌবনে কলঙ্ক হল
বৃদ্ধকাল সামনে এল
মহাকালে এসে করল অধিকারী॥

বসত করি দিবারাতে
ষোলোজন বোম্বেটের সাথে
আমায় যেতে দেয় না সরল পথে
কাজে কামে করে দাগাকারী॥

যে আশায় এই ভবে আসা
তাতে হল ভগ্নদশা
লালন বলে হায় কি দশা
আমার উজান যেতে ভেটেন প'ল তরী॥

২৯

একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে জাত কেমনে রাখ বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে॥

জোলা ছিল কবির দাস
তার তোড়ানি বারো মাস
উঠথে উথলিয়ে;
সেই তোড়ানি খায় যে ধনি
সেই আসে দর্শন পেয়ে॥

ধন্য প্রভু জগন্নাথ
চায় না সে জাত-বেজাত
ভক্তের অধীন সে;
জাতবিচারি, দুরাচারী
যায় তারা সব দূর হয়ে॥

জাত না গেলে পাই নে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে;
লালন বলে জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে॥

৩০

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে তার জাতের বিচার নাই॥
ভক্ত কবির জেতে জোলা
প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা
ধরেছে সে-ই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাই॥

রামদাস মুচি ভবের পরে
পেলো রতন ভক্তির জোরে
তার স্বর্গে সদাই ঘণ্টা পড়ে
সাধুর মুখে শুনতে পাই॥

এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হল
ফকির লালন বলে মিছে কল'
কেন করিস সদাই॥

৩১

জাত গেল জাত গেল বলে এ কি আজব কারখানা।
সত্য কাজে কেউ নয় রাজি সব দেখি তা-না-না-না॥

যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কী জাত ছিলে
কী জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা কেন বল না॥

ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-চামার-মুচি
এ জলেতে সকল শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কারেও ছাড়বে না॥

গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো আর গেল না॥

৩২

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে।
আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে॥

থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা ভাল লাগে॥

অটল-প্রাপ্তি কিসেতে হয়
গুরুর কাছে জান গে রে তাই
টল কি অটল রতি সেই
নেহাত করে জান আগে॥

ভবে ফকিরি সাধন করে
খোলসা রও হুজুরে
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেঁড়ে
আত্মতত্ত্ব জান রে আগে॥

৩৩

কী করি কোন পথে যাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি বসে ওই ভাবনা॥

কেউ বলে মক্কায় যেয়ে, হজ্ব করিলে
যাবে গোণা

কেউ বলে মানুষ ভজে
মানুষ হ'না॥

কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম
ভেস্তখানা।

কেউ বলে ও সুখের ঠাঁই
কায়েম রয় না॥

কেউ বলে মুরশিদের ঠাঁই, খুঁজিলে পায়
আদি ঠিকানা
লালন ভেড়ো তাই না বুঝিয়ে
হয় দোটানা॥

৩৪

কাশী কি মক্কায় যাবি রে মনা চল দেখি যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যাবেলায় উপায় নাই॥

মক্কা যেয়ে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশীধামে
এমনিভাবে কাল কাটালে
ঠিক নামালে কোথা ভাই॥

নৈবেদ্য পাকা কলা
তা দেখে মন ভোলে ভালা
সিন্নি বিলায় দরগা-তলা
তাও দেখে মন খলবলায়॥

চুল পেকে হল হুড়ো
না পেলে পথের মুড়ো
লালন বলে ছন্দি ভুলে
না পেলাম কূল নদীর ঠাঁই॥

৩৫

সোনার মান গেল রে ভাই বেঙ্গা এক পিতলের কাছে।
শাল পটকের কপালের ফের কুষ্টার বানাত দেশ জুড়েছে॥

বাজিল কলির আরতি
প্যাঁচ প'ল ভাই মানীর প্রতি
ময়ূরের নৃত্য দেখে
প্যাঁচায় পেখম ধরতে বসেছে॥

শালগ্রামকে বলে নোড়া
ভূতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া
কলির তো এমনি দাঁড়া
স্থূল কাজে সব ভুল পড়েছে॥
সবাই কেনে পিতল দানা
জহরের তো উল হল না
লালন কয় গেল জানা

চটকে জগৎ মেতেছে॥

৩৬

পাপ-পুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই।
এই দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তাই॥

তিব্বত নিয়ম অনুসারে
এক নারী বহু পতি করে
এই দেশেতে হলে পরে
ব্যভিচারী দণ্ড হয়॥

শূকর গরু দুইটি পশু
খাইতে বলেছেন যিশু
তবে কেন মুসলমান হিন্দু
পিছেতে হটায়॥

দেশ-সমস্যা অনুসারে
ভিন্ন বিধান হতে পারে
সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিচার করে
পাপ-পুণ্যের নাই বালাই॥

পাপ হলে ভবে আসি
পুণ্য হলে স্বর্গবাসি
লালন বলে নমি উর্বশী
নিত্য নিত্য তার প্রমাণ পাই॥

৩৭

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।
ও সে ভাবনগর ফুলে কি আজব শোভা করেছে॥

মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় অকৈতব কথা
কে পেত্যাবে কই কার কাছে॥

কারণ-বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একূল ওকূল
শ্বেতবরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সেই ফুলের মধুর আশে॥
ডুবে দেখ মন দেলদরিয়ায়
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়
লালন কয় যার মূল নাই দেশে॥

৩৮

গৌরপ্রেম করবি যদি ও নাগরী
কুলের গৌরব আর কর না।
কুলের লোভে মান বাড়াবি, কাজ হারাবি
গৌরচাঁদ দেখা দেবে না॥

ফুল ছিটাও বনে বনে, মনে মনে
বনমালী ভাব জান না;
চৌদ্দ বছর বনে বনে, রামের মনে
সীতা লক্ষ্মণ এই তিনজনা॥

যতসব টাকাকড়ি, এ ঘরবাড়ি
কিছুই তো সঙ্গে যাবে না।
কেবল পাঁচ কড়াকড়ি, কলসি-দড়ি
কাঠখড়ি আর চট বিছানা॥

গৌরের সঙ্গে যাবি দাসী হবি
এইটা মনে কর বাসনা;
লালন কয় মনে প্রাণে, একই টানে
এই পিরীতের খেদ মেটে না॥

গ্রন্থতালিকা:
১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার বাউল ও বাউল গান
২. ক্ষিতিমোহন সেন। বাংলার বাউল
৩. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন
৪. মুহম্মদ আবু তালিব। লালন শাহ ও লালন গীতিকা
৫. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত)। লালন স্মারক গ্রন্থ
৬. অন্নদাশঙ্কর রায়। লালন ও তাঁর গান
৭. সনৎকুমার মিত্র। লালন ফকির: কবি ও কাব্য
৮. সুধীর চক্রবর্তী। ব্রাত্য লোকায়ত লালন
৯. আবুল আহসান চৌধুরী। সমাজ সমকাল ও লালন সাঁই
১০. জসিমউদ্দিন। বাউল
১১. ফরহাদ মজহার। সাঁইজীর দৈন্য গান
১২. শক্তিনাথ ঝাঁ। ফকির লালন সাঁই: দেশকাল এবং শিল্প
১৩. শক্তিনাথ ঝাঁ। বাউল-ফকির ধ্বংসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত
১৪. খোন্দকার রিয়াজুল হক। মরমী কবি লালন শাহ: জীবন ও সঙ্গীত
১৫. সোলায়মান আলী সরকার। লালন শাহের মরমী দর্শন
১৬. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। হারামনি
১৭. সুব্রত রুদ্র। লালনের গৌরগান
১৮. ব্রতীশ ঘোষ। বাংলার সূফী ধর্ম ও সাহিত্য
১৯. সর্বানন্দ চৌধুরী (সম্পাদিত)। রামপ্রসাদী
২০. আবুল আহসান চৌধুরী। কাঙাল হরিনাথ: গ্রামীণ মনীষার প্রতিকৃতি
২১. ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পাদিত)। হরিনাথ মজুমদার ও বাঙালি সমাজ
২২. সৈয়দ আবদুল হালিম। মুসলিম আদর্শ ও কর্মের রূপান্তর
২৩. পরেশ কর্মকার। লালনের গান ও মানবতাবাদ

অঙ্কন: *নির্মলেন্দু মণ্ডল*